কৃষণ চন্দর

বিকুলিক

অনুবাদঃ এ. বি. এম. কামালউদ্দিন শামীম

পিকনিক

কৃষণ চন্দর

অনুবাদ

এ. বি. এম. কামালউদ্দিন শামীম

মুক্তধারা

মুক্তধারা ৬৬৫

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১
বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ ঃ এপ্রিল ১৯৭৯
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৮১
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা ঃ সৈয়দ এনায়েত হোসেন
মুদ্রাকর ঃ
প্রভাংশুরঞ্জন সাহা
ঢাকা প্রেস
৭৪ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১
বাংলাদেশ
[স্বঃ] প্রকাশক
মূল্য ঃ বোর্ড বাঁধাই ঃ আট টাকা
সুলভ সংস্করণ ঃ পাঁচ টাকা

PICNIC
[A Novelette for Children]
By Krishan Chander
Translated by A. B. M. Kamaluddin Shamim
Cover & Illustration : Syed Enayet Hossain
Second Print : August 1981
MUKTADHARA
[Swadhin Bangla Sahitya Parishad]
74 Farashganj
Dacca-1
Bangladesh
Price : Board Binding : Taka 8·00
Paperback Edition : Taka 5·00

আনিস সিদ্দিকী

শব্দগুচ্ছের মালাকরেরা সংখ্যায় লঘু—তবু নিতান্ত কম নন
তবে কি না মরার পরও যাঁরা বাঁচেন তাঁরা নহেন অগণন

রোমানজী হাই স্কুলের ছেলেমেয়েরা পিক্‌নিক করার জন্য গোয়া যাচ্ছে। পনের দিনের জন্য। স্কুলের তরফ থেকে সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বোম্বের বন্দরে একটা বড় স্টীমার নোঙ্গর করে রাখা হয়েছে। পিক্‌নিকের জন্য চাঁদা ধার্য করা হয়েছে মাত্র পঁচিশ টাকা। এর মধ্যে যাওয়া-আসার ব্যয় এবং গোয়ায় পনের দিনের সফরের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পিক্‌নিকে যাওয়ার জন্য ছেলেমেয়েরা ভেঙে পড়েছে। মিছেমিছি স্টীমার চালিয়ে হৈ হুল্লোড় করে, হাততালি দিয়ে নেচে গেয়ে সবাই আনন্দ প্রকাশ করছে। দোতালা স্টীমার। উভয় তালাতেই ছেলেমেয়েরা জেঁকে বসেছে। ডেকে দাঁড়ানো ছেলেরা তাদের সঙ্গীদের ডাকছে। ওদের টিকেট পরীক্ষা করা হচ্ছে, ভেতরে আসার জন্য ওরা ছটফট করছে। সমুদ্রোপকূলে অবস্থানকারী ছেলেরা স্টীমারের সিটি ও শব্দাবলীর জবাব দিচ্ছে। তীরে দাঁড়ানো বাপ-মা পিক্‌নিক গমনকারী ছেলে-মেয়েদের উপদেশ দিচ্ছে আর তারা সেদিকে না তাকিয়ে ঘাড় না নেড়ে মুখে শুধু হুঁ হাঁ করছে। কারণ মন তাদের তখন পিক্‌নিকে।

অস্বাভাবিক রকম মোটা, গোলগাল চেহারার অধিকারী রুস্তমকে বোমানজী হাই স্কুলের সবচেয়ে মোটা ছেলে মনে করা হতো। সে তার মাংসে থলথল করা মোটা বাহু উঁচু করে চিৎকার করে উঠলো, ও সঞ্জীবওয়া---জামু---কাম ইন্---কাম ইন্।

রুস্তম সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। সঞ্জীবওয়া ও জামু তার বন্ধু। ওরা তখন হেড মাস্টারকে পিক্‌নিকের টিকেট দেখাচ্ছে। তাদের দেখেই রুস্তমের এ উল্লাসময় চিৎকার। তার হাতে রকমারী সুন্দর বেলুন। হঠাৎ একই সাথে কয়েকটি বেলুন ফেটে যাওয়ার শব্দ হলো। রুস্তম পিছনে তাকিয়ে দেখে তার পিছনে দাঁড়ানো বিষ্ণু বেলুনে পিনের খোঁচা দিচ্ছে আর খিলখিল করে হাসছে। বিষ্ণুর

পাশে দাঁড়িয়ে তার ন'বছরের বোন সুধা খুশীতে চিৎকার করছে। সুগঠিত দেহের অধিকারী বিষ্ণু নবম শ্রেণীতে পড়ে। তার আচরণে রুস্তমের রাগ হলো। সে পিছনে ফিরে বিষ্ণুকে ঘুষি মারতে চাইলো। কিন্তু মোটা হওয়ার কারণে ঘুষি দেয়ার আগেই বিষ্ণুর পাল্টা ঘুষিতে চিৎ হয়ে পড়ে গেলো। সব ছেলেমেয়ে হাততালি দিয়ে হেসে উঠলো।

স্টীমার ঘাট থেকে কিছু দূরে দেখা গেল একটা গোল পাথরকে পদাঘাতে এগিয়ে আস্তে আস্তে সুখো আসছে। সুখো পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। তার গায়ে হাতে ধোয়া একটা জামা, পরনে তালি দেয়া একটা প্যান্ট। কাঁধে একটা ঝোলা। পাথরকে ধাক্কা দিয়ে দিয়ে নিয়ে আসার সময়ে তার স্যাণ্ডেলের একটা পেরেক উপরের দিকে উঠে গিয়ে তার পায়ে খোঁচা দিল। সুখো এক পা উপরে তুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সামনের দিকে এগোলো। এ সময়ে তার বন্ধু কাসেমকে আসতে দেখা গেলো। কাসেমের পিতা হাশেম ভাই ভেণ্ডি বাজারের সবচেয়ে বড় বিত্তবান ব্যবসায়ী ও চামড়া বিক্রেতা।

হাশেমের পিছনে একটা কুলী। কুলীর মাথায় একটা ট্রাঙ্ক, একটা সুটকেস, বিছানাপত্র ও ফলের ঝুড়ি।

কাশেমকে দেখে সুখো বসে পড়লো এবং পাথরের টুকরোতে খুলে যাওয়া পেরেক ঠুকতে লাগলো। ততক্ষণে কাশেম তার পিছনে এসে পিঠে একটা টোকা দিয়ে বলল, এই সুখো কি করছিস ?

সুখো বললো, স্যাণ্ডেল ঠিক করছি।

কাশেম বললো, আরে মুচীর ছেলের স্যাণ্ডেলও কি কখনো খারাপ হয় ?

হাইস্কুলের সবাই জানতো যে সুখো মুচীর ছেলে। তার পিতা সামু ইরানী রেস্টুরেন্ট কায়কাউসের সামনের ফুটপাতে বসে জুতো মেরামতের কাজ করে। আবসর সময়ে সুখো পিতাকে সাহায্য করে। শৈশব থেকেই সুখো কঠোর পরিশ্রম করে আসছে। ছেলেরা তাকে মুচীর ছেলে বলে ডাকলে তার একটুও খারাপ লাগে না। কারণ সে তো আসলেই মুচীর ছেলে। কিন্তু মুচীর ছেলে হলে কি হবে সুখো লেখাপড়া ও খেলাধূলায় ছিল খুবই তুখোর। কাশেমের প্রশ্নের জবাবে সুখো হাসতে হাসতে বললো, শুনো কাশেম, মুচীর ছেলের জুতোই সবচেয়ে বেশী খারাপ হয়।

কাশেম সুখোর কাঁধে হাত রেখে হাসতে লাগলো। উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব। বলল, আমি ভেবেছি তুই আসবি না।

সুখো বলল, আমিও মনে করেছিলাম যে, আমি আসব না।

---তারপর কিভাবে এলি ?

---আব্বা টাকা দিয়েছেন।

---কত ?

সুখো পাঁচ টাকার একটা নোট পকেট থেকে বের করে দেখালো।

কাশেম বলল, কিন্তু এতো পাঁচ টাকা, আর পিক্‌নিকের চাঁদা হচ্ছে পঁচিশ টাকা।

সুখো নিশ্চিন্তভাবে বলল, আমার কাছে পাঁচ টাকা আছে, এ পাঁচ টাকাতেই আমি গোয়া দেখে আসব। পায়ে হেঁটে যেতে হলেও আপত্তি নেই।

কাসেম কি যেন ভাবলো। তারপর পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে সুখোর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, আব্বা আমাকে পঁয়ত্রিশ টাকা দিয়েছেন, এ দশ টাকা আমার কাছে ছিল, তুই নিয়ে নে।

সুখো বলল, এখন তাহলে পনের টাকা হলো। স্যারকে বলব বাকিটা ধার দিতে।

---ঠিক আছে বলিস। কিন্তু তোর বিছানা কই ?

---নেই।

---সুটকেস ?

এই যে ! সুখো তার কাঁধে ঝোলানো থলের প্রতি ইঙ্গিত করলো।

কাসেম থলে দেখে বলল, ভারী লাগছে, কি ওখানে ?

সুখোর চোখ খুশিতে চমকে উঠলো, বলল, মিষ্টি।

---মিষ্টি ?

---হাঁ। অনেক আছে, হাত ঢুকিয়ে বের করে নে।

কাসেম তাড়াতাড়ি থলেতে হাত ঢোকালে ভেতর থেকে চিঁউ চিঁউ শব্দ এলো এবং একটা কুকুর ছানা তার হাতে লাগলো। কাসেম চিৎকার করে বলল, আরে একি ব্যাপার ?

সুখো হাসতে হাসতে কুটি কুটি হয়ে বললো, মিষ্টি, খাবি নাকি খা।

কাসেম অপ্রস্তুত হয়ে গেল। সে ভাব গোপন করার জন্য বলল, এই কুকুরটাও তোর সাথে যাবে নাকি ?

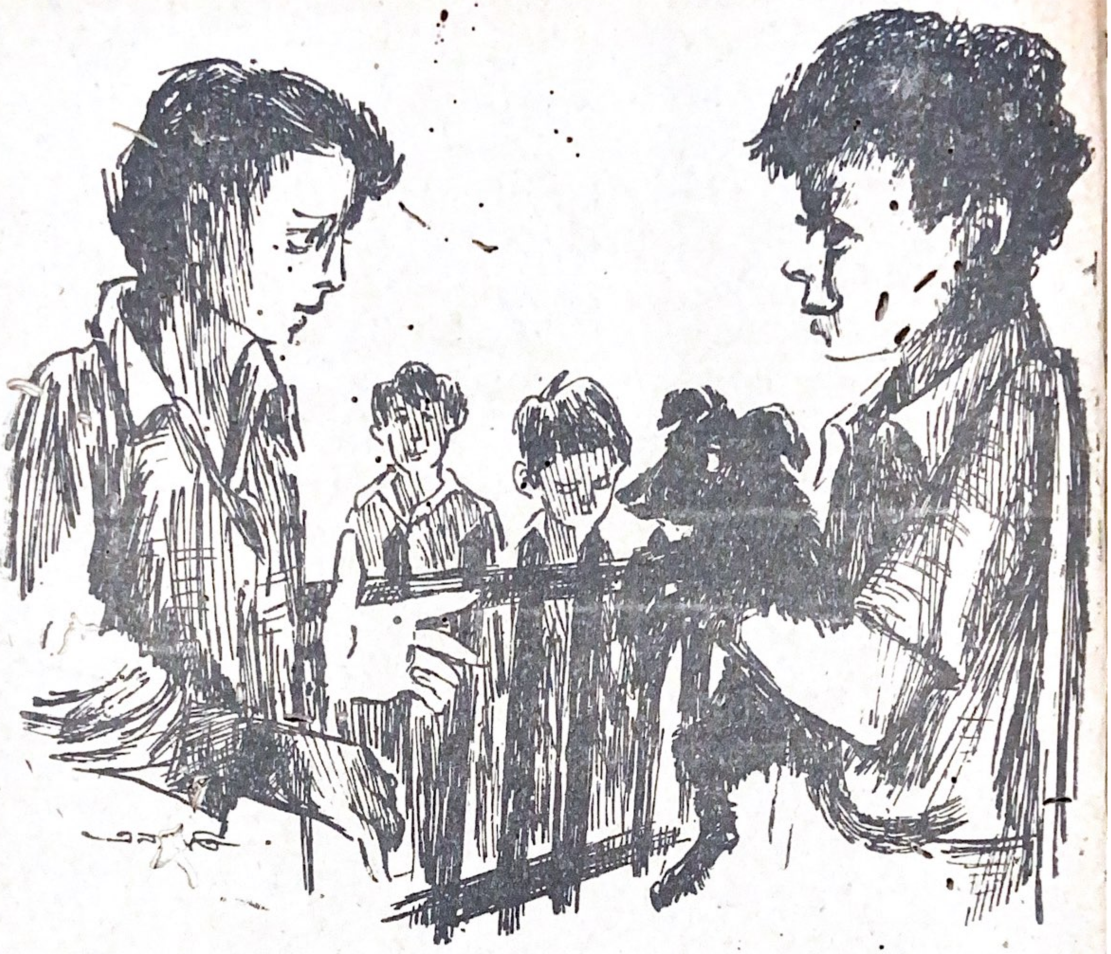

—হাঁ

—কিভাবে ?

সুখো কাসেমের হাত থেকে কুকুরছানাটি থলের ভেতর রেখে বলল, এভাবে।

দু'বন্ধু পাশাপাশি হেঁটে সামনের দিকে অগ্রসর হলে বিষ্ণুর সাথে দেখা হলো। দুটি বাচ্চা চাকর বিষ্ণুর জিনিসপত্র বাড়ী থেকে নিয়ে এসেছে, সেসব স্টীমারে তোলার জন্য বিষ্ণু নিচে নেমে এসেছে। বিষ্ণু কাসেমের সহপাঠী। কাসেমের হাতে হাত মিলিয়ে সে বলল, হ্যালো কাসেম।

হ্যালো বিষ্ণু। উক্ত করমর্দন শেষে কাসেম বিষ্ণুর জিনিসপত্রের দিকে তাকিয়ে বলল এ-তো ?

সুখো বলল, ব্যাপার গুরুতর বলে মনে হচ্ছে। স্মাগলাররাও আজকাল এতো জিনিস নিয়ে যেতে পারে না।

বিষ্ণুর রাগ হলো। সুখোর দিকে তাকিয়ে সে ক্রুদ্ধ ভাবে বলল, আমাকে স্মাগলার বানানো হচ্ছে! রাখো মুচীর ব্যাটা, মজা দেখাচ্ছি।

বিষ্ণু সুখোর দিকে ছুটলো। সুখো তিড়িং বিড়িং করে হেড মাস্টারের নিকট গিয়ে তাঁর সাথে কথা বলতে লাগলো। সে হেড মাস্টারকে পনের টাকা দিয়ে তাঁর কাছে দশ টাকা ধার চাইলো। কিন্তু হেড মাস্টার টাকা দিতে অস্বীকার করলেন। কারণ সুখোকে টাকা ধার দেয়ার অর্থ হলো অন্য ছেলেদেরও দিতে হবে। পিকনিক কমিটি এমনিতেই নিজ তহবিল থেকে অনেক টাকা খরচ করছে। হেড মাস্টার সুখোকে বুঝিয়ে বলার পর সুখো একপাশে উদাসভাবে দাঁড়িয়ে রইলো। ছেলেরা তখন টিকেট দেখিয়ে একের পর এক স্টীমারে প্রবেশ করছে। কাসেম সুখোর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সে ভাবতে লাগলো, কি করে সুখোকে স্টীমারের ভেতরে নিয়ে যাওয়া যায়।

ছেলেরা খুশিতে হাততালি দিচ্ছে, কারণ স্টীমার সাইরেন বাজিয়ে বন্দর ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। সাইরেন সমুদ্রের পানিতে গুঞ্জরিত হচ্ছে, ছেলেরা হৈ চৈ কোলাহলে চিৎকার করছে। সুখো [illegible] সজল চোখে মুখ ফিরিয়ে নিল। হেড মাস্টার কাসেমের প্রতি তাকিয়ে তিক্তস্বরে বললেন, তুমি আসছনা কেন?

আসছি স্যার বলেই কাসেম হেড মাস্টারের দিকে অগ্রসর হলে সুখো কাসেমের জামার খুট টেনে ধরলো।

তার মাথায় একটা নতুন বুদ্ধি এসে গিয়েছিল। কাসেমের কানে কানে সে কি যে বলল। সে কথা শুনে কাসেমের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সুখোর হাতে জোরে চাপ দিয়ে স্টীমারের দিকে ছুটে গেল। স্টীমারের একপাশে কিছু সংখ্যক জেলে নৌকো মাছ ধরার জন্য জাল ফেলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। কাসেম একজন জেলের সাথে কি যেন বলল এবং তার হাতে একটা পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিল। টাকা হাতে নিয়ে জেলে পাল তোলা নৌকোয় বাঁধন দিয়ে উপকূলের দিকে এগিয়ে চলল। তীরে গিয়ে সবার অগোচরে জেলেটি সুখোকে নৌকোয় তুলে নিল। ততক্ষণে কাসেম স্টীমারের উপরের ডেকে উঠে দাঁড়িয়েছে। সুখোকে নৌকোয় করে আসতে দেখে

হাসি মুখে সে হাত নাড়ালো। সুখো স্টীমারের কাছাকাছি এলে কাসেম ডেকের উপর থেকে একটা মোটা লম্বা রশি হাতে নিয়ে তার এক মাথা পানিতে ফেলে অন্য মাথা হাতে দাঁড়িয়ে রইলো। ততক্ষণে স্টীমার শেষবারের মত সাইরেন বাজিয়ে নড়ে চড়ে উঠেছে। ততক্ষণে সুখো নীচে থেকে রশির এক মাথা জড়িয়ে ধরে বানরের মত উপরের দিকে উঠতে শুরু করেছে। এ সময়ে বিষ্ণুসহ কয়েকটি ছেলে সুখোকে দেখে ফেললো।

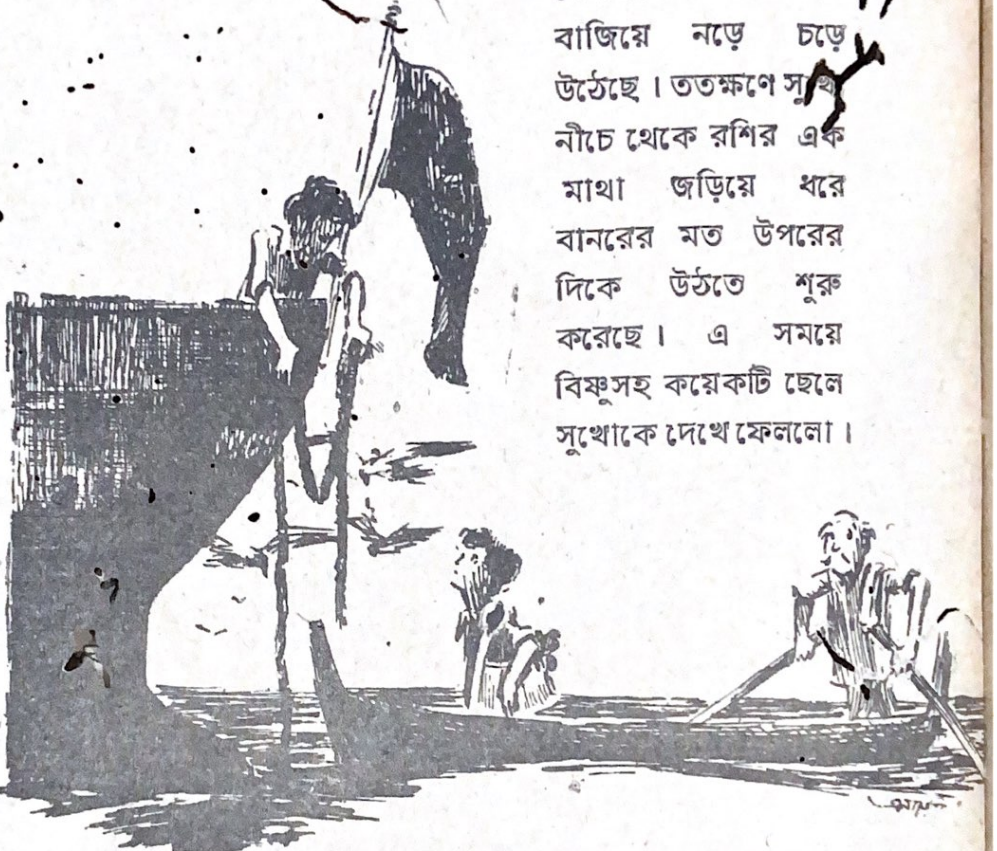

বিষ্ণু চিৎকার করে বলল, ধরো ধরো, মুচীর ছেলে সুখো টাকা না দিয়েই পিক্‌নিকে যাচ্ছে।

একজন শিক্ষক সুখোকে দেখে ফেলে তার দিকে ছুটে গেলেন। সুখো ততক্ষণে ডেকের উপরে এসে কাসেমের হাতে থলি দিয়ে ছেলে-মেয়েদের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল। চতুর শিক্ষক সুখোকে অনুসরণ করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সুখো ধরা পড়ল। উল্লিখিত শিক্ষক উপর থেকে নিচের দিকে এবং হেডমাস্টার নিচে থেকে উপরের দিকে ওঠার সময়ে সুখোকে সিঁড়ির উপর ধরে ফেললেন এবং কানে ধরে উপরের ডেকে নিয়ে এলেন। তারপর একটা বেত হাতে নিয়ে

মারমুখী হলে সুখো হাত জোড় করে বলল, ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে স্যার, এক্ষুণি পিকনিকের চাঁদা দিচ্ছি, পুরো পঁচিশ টাকাই দিচ্ছি।

হেড মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে ?

সুখো দশ টাকা দিয়ে বলল, এই নিন দশ টাকা।

বাকি টাকা ? হেড মাস্টার চোখ কপালে তুললেন।

---বাকি টাকা পরিশ্রম করে আদায় করছি।

সে কিভাবে ? হেড মাস্টার তার কান ধরে জিজ্ঞেস করলেন।

---কান ছাড়ুন, এক্ষুণি বলছি।

শিক্ষক সুখোর কান ছেড়ে দিলেন।

সব ছেলেমেয়ে সুখোর দিকে তাকিয়ে আছে। সুখোর দুরবস্থা দেখে কিছু সংখ্যক ছেলে আনন্দ প্রকাশ করছে, কেউ কেউ উদাসীন-ভাবে তাকিয়ে আছে। সুখো কাসেমের হাত থেকে থলে টেনে নিয়ে তার ভেতর থেকে জুতো পালিশের সরঞ্জাম বের করলো। ব্রাশ ও কালির কৌটা হাতে নিয়ে সে বলল,

সবার জুতো করব পালিশ
দেবো চাঁদা পেয়ে বখশিশ।

সুখো জুতো পালিশ করতে লাগলো। পালিশ করা জুতো চকচক করছে আর তার থলেতে খুচরো পয়সা জমছে। এ পয়সা তার পরিশ্রমের পয়সা।

এ যাবত সুখো কখনো নিজের স্কুলের ছেলেদের জুতো পালিশ করেনি। এজন্য প্রথমে কিছুটা দ্বিধা কিছুটা সংকোচ লেগেছিল, কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যে সে ভাব কেটে গেল। সে ভাবল, সতিকারের পরিশ্রমে লজ্জা কিসের ?

পিকনিকে গমনকারী ছেলেমেয়েরা সুখোর বুদ্ধির তারিফ করলো। তখন সবাই চাচ্ছিল যে, সুখো পিকনিকে যাক না! এজন্য তারা নিজেদের জুতো পালিশ করিয়ে সুখোকে পয়সা দিতে লাগলো। যাদের জুতো সকালে পালিশ করা হয়েছে তারাও সুখোর হাতে নতুন করে পালিশ নিল। তাদের মনে হচ্ছিল যে তারা যেন জুতো পালিশ নয় বরং সুখোর সাথে হাত মেলাচ্ছে। বেশ তাড়াতাড়ি বাকি টাকা সংগ্রহ হলে সুখো শিক্ষকের হাতে দিয়ে দিল। শিক্ষক সুখোকে জড়িয়ে ধরে তার বুদ্ধির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কিছু সংখ্যক ছেলেমেয়ে সুখোকে ঘিরে তখন আনন্দে নাচতে, গাইতে ও হাততালি দিতে

লাগলো। বিষ্ণু ও তার কয়েকজন সাথী দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তারা সুখোকে অবজ্ঞার চোখে দেখতো। সুখো সেসব থোড়াই পরোয়া করতো।

হাসিখুশিতে দিন কেটে গেল। সমুদ্রের দৃশ্য সবাইকে কেমন যেন আত্মভোলা করে দিল। রাতে কাসেম ও সুখো ঘুমোবার জন্য উপরের ডেকে ভাল দেখে একটা জায়গা বেছে নিলো। কাসেম সুখোকে আধাআধি বিছানা ভাগ করে দিল।

বিছানা পাতা শুরু করলে হঠাৎ কোথা থেকে বিষ্ণু গিয়ে হাজির হলো। গায়ে পড়ে ঝগড়া করার সুরে সে বলল, বিছানা উঠাও, এ কোণ আমার, এখানে আমি ঘুমোব।

কাসেম ও সুখোর রাগ ধরলো। বিষ্ণু ছিল ওদের চেয়ে তাগড়া, তবে দুজন মিলে বিষ্ণুকে কাবু করতে পারতো। কাসেম জবাব দিতে চাইলো, কিন্তু সুখো তাকে বুঝিয়ে বলল, পিক্‌নিকের প্রথম দিনেই ঝগড়া বিবাদ ভাল দেখায় না। এই বলে সুখো তার বিছানা গুটিয়ে নিল।

কাসেম বলল, তা হবে কেন ? এ জায়গা আমাদের, কেন আমরা এটা ছাড়ব ?

সুখো কাসেমের বিছানাও গুটিয়ে দিয়ে বলল এসো তো! এখানে বিষ্ণুকে শুতে দাও, আমরা ডেকের অন্য কোণে গিয়ে ঘুমোব। বহু জায়গা খালি পড়ে আছে।

কাসেম অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুখোর অনুরোধ রাখলো। বিছানা নিয়ে সেও সুখোর সাথে চলে গেল। বিষ্ণু বিজয়ীর হাসি হেসে সেখানে বিছানা পাতলো। অথচ কাসেম ও সুখো ঝগড়া বিবাদ পছন্দ না করার কারণেই মেনে নিয়েছিল।

কাসেম ও সুখো ডেকের অপর পাশে গিয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লো। আকাশে তারগুলো মিটিমিটি জ্বলছে। চারদিকে ছেয়ে যাওয়া আঁধারে ওদের মনে হচ্ছে যেন আকাশের ডেকে শুয়ে তাঁরাগুলো চোখ ঠারছে। সুখো ভাবলো ওরাও বোধকরি আমাদের মতোই পিক্‌নিকে যাচ্ছে। ধীরে ধীরে ঘুমের ঘোরে তার চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো। সমুদ্রের বুক চিরে স্টীমার তখন সশব্দে ছুটে চলছে।

হঠাৎ ওদের ঘুম ভেঙে গেলো। দেখলো স্টীমার প্রবলভাবে দুলছে। তাদের গায়ে মুখে বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ছে। আকাশে মেঘের গর্জন, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। সমুদ্রের স্রোত অশান্ত হয়ে উঠেছে। বড় বড় ঢেউ প্রবল গর্জন করে ছুটে স্টীমারের গায়ে ধাক্কা খাচ্ছে। আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হচ্ছে এবং সমুদ্রের স্রোত ডেকে এসে পড়ছে। চারদিকে শুধু জল আর জল। উপর থেকে নিচে সর্বত্র জল। সবার কাপড় ভিজে সপসপে হয়ে গেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভয়ে কাঁদতে শুরু করেছে। ঢেউএর ধাক্কার পর মনে হচ্ছিল যেন হাজার টন ভারি হাতুড়ি স্টীমারের গায়ে এসে পড়ছে এবং স্টীমার এক্ষুণি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। আর সকলে সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যাবে।

হঠাৎ বিপদ সংকেত শোনা গেল। একজন শিক্ষক একটা ভেজা হারিকেন হাতে নিয়ে উপরে এসে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, এক্ষুণি সবাই নিচে নেমে যাও, জাহাজ ছেড়ে দিতে হবে, জাহাজে জল উঠতে শুরু করেছে এবং---

তারপর আর কিছু শোনা গেল না। বাতাসের ঝাপটা ও সমুদ্রের একটা ভয়াবহ স্রোত এসে পড়ায় হারিকেন নিভে গেল। সেই সময়ে শিক্ষক ডেকের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন।

বাতাস এতো জোরে প্রবাহিত হচ্ছিল যে, ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা কারো পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। কাসেম ও সুখো হোঁচট খেয়ে পড়ি কি মরি করে নিচে নেমে গেল।

সুখোর মনে হলো যেন ভয়াবহ স্বপ্ন দেখছে। ছেলেমেয়েদের চিৎকার, ঝড়ের শব্দ, কাপ্তান ও মাল্লাদের দৌড়ে দৌড়ে আদেশ দেয়া। লাইফ বোট বের করা, সমুদ্র ও মেঘের গর্জন, বিজলীর চমক, জাহাজের দোল খাওয়া, হারিকেনের অস্পষ্ট আলো, এলোমেলো চুলে ভয়ার্ত চেহারার একেক জন---এতো ভয়াবহ স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়।

সুখো এতোটা ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে তার সামনে কি হচ্ছিল সে ভালভাবে বলতে পারবে না। কখন জাহাজে ছিল, কখন লাইফবোটে গিয়ে বসেছে কিছুই তার মনে নেই। কিছুই সে বুঝতে পারল না। হঠাৎ মনে হলো, দুজন মাল্লা তাকে লাইফবোটে ওঠানোর চেষ্টা করছে কিন্তু একটা প্রবল ঢেউ তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এ সময়ে অন্য দিক থেকে ছেলে-মেয়েতে পরিপূর্ণ অন্য একটি লাইফ বোট দেখা গেল।

হঠাৎ বিজলী চমকালো, মুহূর্তের জন্য সুখো বৃষ্টি ভেজা বিপন্ন বন্ধুদের চেহারা দেখলো। পরমুহূর্তে চারদিকে আঁধার ছড়িয়ে পড়লো।

লাইফবোটে আশ্রিত ছেলে-মেয়েরা মৃত্যু এসে গেছে ভেবে কাঁদতে লাগলো। অবস্থা ছিল সত্যি ভয়াবহ। ঢেউএর ধাক্কায়

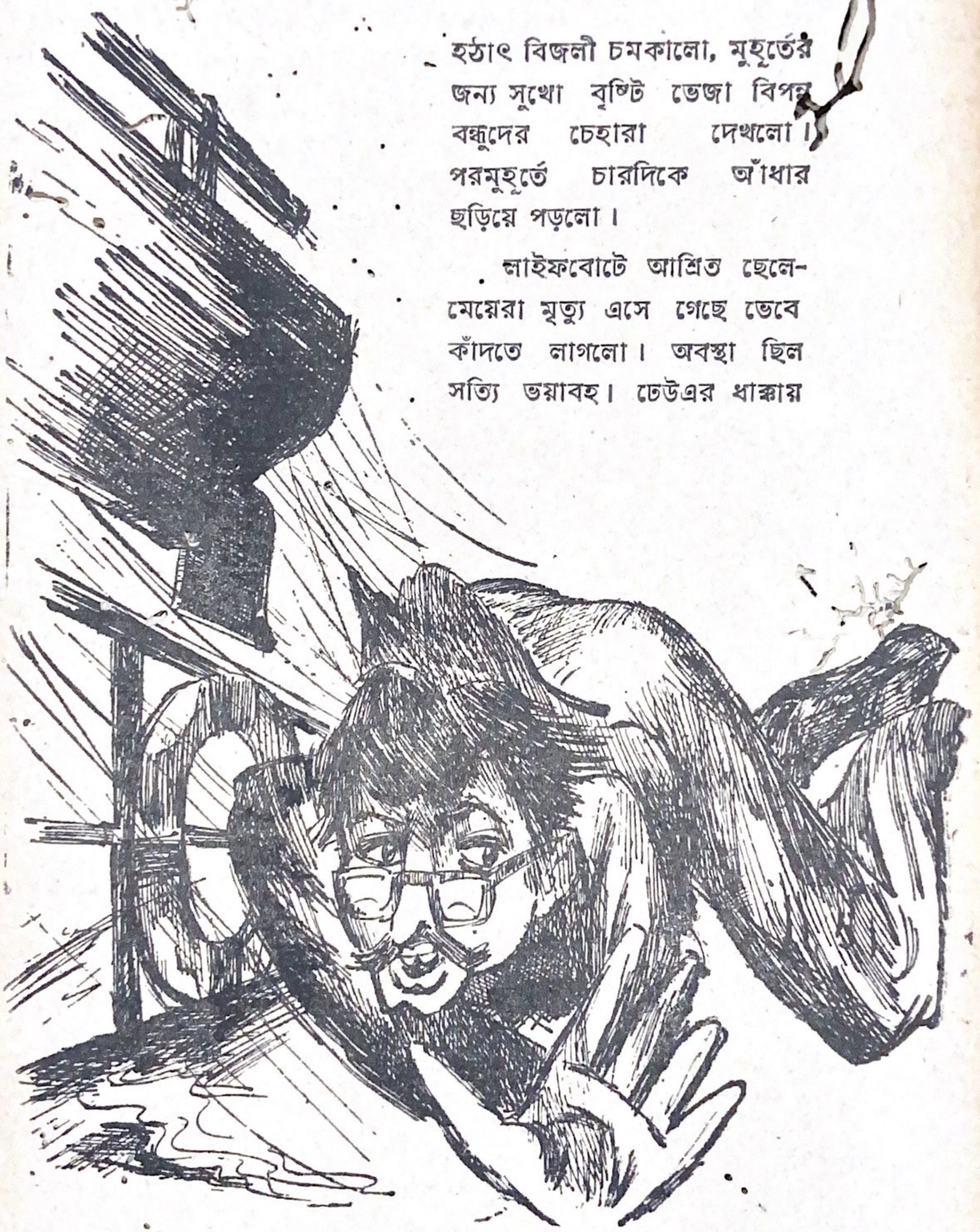

লাইফবোট কখনো ডানে কখনো বামে দোল খাচ্ছে আর মনে হচ্ছে এক্ষুণি ডুবে যাবে। সমুদ্রের গায়ে কে যেন কালি লেপে

দিয়েছে। ছেলে-মেয়েদের মনে হ'ল কেউ যেন তাদের রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে না। ডান দিক থেকে ঢেউএর আক্রমণ হলে ছেলে-মেয়েরা ভয়ে লাইফবোটের বাম পাশে চলে যায়, বাম দিক থেকে আক্রমণ হলে ডান দিকে চলে যায়। এ সময়ে ভয়ে তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে এবং জোরে জোরে কেঁদে ওঠে।

সুখো ক্রোধে চিৎকার করে বলল, সবাই নিজ নিজ জায়গায় বসে থাকো, ডান-বামে যাওয়ার চেষ্টা করো না। তাহলে নৌকো ডুবে যাবে।

বহু ছেলে-মেয়ে কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলল, আমরাতো ডুবেই যাচ্ছি, নতুন করে কি আর ডুববো।

লাইফ বোট আশঙ্কাজনকভাবে দোল খাচ্ছিল। উঁচু উঁচু ঢেউ ছুটে এসে লাইফবোটে প্রবল ধাক্কা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ একটা ছোট্ট মেয়ে হাঁটু গেঁড়ে বসে আকাশের দিকে দুহাত তুলে খোদার কাছে প্রার্থনা করতে লাগল। মেয়েটির নাম হোস্না। তার বয়স আট বছর। তাকে প্রার্থনা করতে দেখে বিষ্ণুর বোন সুধারও প্রার্থনা করতে ইচ্ছে হলো। সেও দুহাত তুলে চোখ বন্ধকরে প্রার্থনা করতে লাগল।

এ সময়ে আদিবাসী বয়েলের ছেলে জামু জোরে জোরে গাইতে লাগলো, কিশতি মেরে বাঁচালে উপরওয়ালে, ও উপরওয়ালে।

বহুসংখ্যক ছেলে-মেয়ে তার সাথে এ গানের কলি আওড়াতে শুরু করলো। এভাবে যার যা জানা ছিল হামদ, ভজন সব শেষ করলো। পুঁজি শেষ হওয়ার পর তারা সকলে বয়স্কাউট ও গার্ল গাইডএর গান গাইতে লাগলো। সে গান শেষ হলে বইয়ের কবিতা যার যা মুখস্থ ছিল গানের সুরে আবৃত্তি করলো। তারপর গাইল সিনেমার গান, যার যে গান মনে ছিল তারা সবাই সমস্বরে সে গান গাইলো।

সারারাত ছেলে-মেয়েরা গান গেয়ে কাটালো। ঝড় গর্জন করতে লাগলো, ওরা গাইতে লাগলো। গানের তালে তালে সব বেদনা ভুলে গেল। সারা রাত নৌকো দোল খেল। প্রার্থনা বা গানের প্রভাব অথবা স্রষ্টার করুণা—যাই হোক না কেন কয়েকবারই নৌকো ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল।

এক সময়ে ঝড়ো হাওয়ার প্রকোপ কমে এলো। ঢেউ-এর দাপটও শিথিল হয়ে এলো। শেষ রাতের দিকে সমুদ্র শান্ত

হলো। লাইফবোট স্বাভাবিক ভাবে জলে ভাসতে লাগলো। প্রভাতের উজ্জ্বল আলোয় ওরা দেখল যে, নৌকো সমুদ্র তীরের কাছাকাছি এসে পেঁৗছেচে। দুরে অথৈ কালো জল। অদূরে ঘন কালো অরণ্য দেখা গেল। নারকেল গাছ ঘেরা। অনুকূল বাতাসে নৌকো চালিয়ে তারা সেখানে গিয়ে উঠলো এবং ঘন অরণ্যের মৃত্তিকার কোলে কিছুক্ষণ সংজ্ঞাহীনের মতো পড়ে রইলো। আসলে সেটা ছিল একটা দ্বীপ অথচ আরা তাকে সমুদ্র তীর বলে ভুল করেছিল।

কিছুক্ষণ আচ্ছন্নভাবে পড়ে থাকার পর ছেলে-মেয়েরা নড়ে চড়ে উঠলো। পেটে তাদের ক্ষুধার আগুন জ্বলে উঠলো। আট বছরের মেয়ে হোসনা কাঁদতে লাগলো।

সুখো তাকে জিজ্ঞেস করলো, কি হয়েছে?

ক্ষুধা পেয়েছে। কান্নাকাজড়িত কণ্ঠে সুধা জবাব দিল।

সুধাও সজল চোখে বলল, আমারও ক্ষুধা পেয়েছে।

সুখোর কাছে বসে তার কুকুর ছানাটি টেঁও টেঁও করতে লাগলো। সারারাত ঝড়ের জলে ভেজার পর দ্বীপের বালি তার সারা দেহে জড়িয়ে গেল। সুখো আদর করে করে সে বালু ছাড়িয়ে দিচ্ছিল। এ সময়ে নিকটে কি একটি জিনিস পতনের শব্দ শুনে সবাই চমকে উঠলো। বিষ্ণু শব্দ লক্ষ্য করে ছুটে গিয়ে একটা নারিকেল হাতে ফিরে এলো। তারপর নারকেলটি পাথরের সাথে ঠোকর দিয়ে ভেঙ্গে জল পান করে ভেতরের সাদা অংশ খেতে লাগলো। আমাকে দাও আমাকে দাও বলে সবাই বিষ্ণুকে ঘিরে ধরল, কিন্তু বিষ্ণু তার বোন সুধা ছাড়া কাউকে কিছু দিল না। সবাইকে দেখিয়ে তির্যক হাসি হেসে বিষ্ণুর নারিকেল খাওয়ায় কারো কারো গা জ্বলে গেল। জামু ও তার বন্ধু বসন্ত দুটি গাছে উঠে নিচে নারিকেল ফেলতে লাগল। বিষ্ণু একবার এপাশে আবার ওপাশে ছুটোছুটি করছিল কিন্তু উপর থেকে এমনভাবে ফেলা হচ্ছিল যেন বিষ্ণুর হাতে একটা নারিকেলও যেতে না পারে। কিছুক্ষণের মধ্যে সবাই দুটো-তিনটে করে নারিকেল পেলেও বিষ্ণু একটিও পেলনা। ক্রুদ্ধ হয়ে বিষ্ণু দুতিনটি ছেলের কাছ থেকে নারকেল কেড়ে নিল। একটা নারিকেল সে তার বোন সুধার নিকট থেকেও কেড়ে নিল। সবার কাছে একাধিক থাকার কারণে এ নিয়ে কেউ প্রতিবাদ করল না। পাথরের সাথে গাছের সাথে নারকেল ভেঙ্গে ভেঙ্গে সবাই ক্ষুধা নিবারণ করলো। নারিকেলের মিষ্টি জল

এবং সাদা আঁশ খেয়ে সকালের নরম রোদে কিছুক্ষণের মধ্যে তারা ঘুমিয়ে পড়লো।

তখন খুবই ভাল লাগছিল। মাটির বিছানায় শুয়ে বিষ্ণু সবার মনের কথা বলল। বলল আহা, স্কুল নেই, বাবা নেই, মা নেই, পরীক্ষা নেই, মাস্টার নেই, মাটিতে পড়ে থাকো, নারিকেল খাও। বেশ মজা বেশ মজা।

গোপাল সিং আরো কিছু যোগ করে বলল, আর থাকার জন্য ঘর নেই, শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য আগুন নেই, রাতে বাঘ এসে সবাইকে খেয়ে ফেলবে।

বাঘের কথা শুনে সুধা ও হোসনার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল। তারা বললো, হায় বাঘ!

সুখো তাদের সাহস দিয়ে বলল, ভয় পেওনা, এখন আমরা মাটির উপর রয়েছি, সম্ভবত নিজের দেশেই এসে গেছি।

বিষ্ণু ভয়ার্ত স্বরে বলল, সম্ভবত কোন টাপুতে এসে পড়েছি, সারা জীবন এখানে সেই রবিনসন ক্রুসোর মতো কাটাতে হবে, যার কথা আমরা বইতে পড়েছি।

কাসেম বলল, মনে হয় আমরা গোয়ার আশেপাশে রয়েছি।

সুখো প্রস্তাব করল যে, সামনের পাহাড় চূড়ায় উঠে দেখলে বোঝা যাবে আমরা কোথায় রয়েছি।

সুধা মাথা নেড়ে বলল, হাঁ তাই। ওখানে উঠলে কোন গ্রাম দেখা যেতে পারে। এখান থেকে তো জঙ্গল আর পাহাড় ছাড়া কিছুই দেখা যায়না।

সুখো নেতাসুলভ কণ্ঠে বলল, অবিলম্বে আমাদের পাহাড় চূড়ায় উঠতে হবে, বল, কে কে আমার সাথে যাবে?

সুধা বলল, আমি যাব।

সুখো বলল, না এসব জঙ্গলের ব্যাপার, মেয়েরা যেতে পারবে না।

শিখ ছেলে গোপাল সিং বলল, আমি যাব, আমার বাবা শিকারী ছিলেন, আমি তাঁর সাথে বনে যেতাম।

জাম্ বলল, আমি তো বয়েল, বন আমার ঘর।

সুখো বলল, ঠিক আছে, আর কে যাবে?

কাসেম কিছু না বলে সুখোর পাশে এসে দাঁড়ালো। পাসিয়ান ছেলে গোটা সোটা রুস্তম শায়িতাবস্থা থেকে হাত তুলে বলল, আমিও যাব।

সঞ্জীবওয়া গম্ভীর স্বরে বলল, না, তুমি যেতে পারবে না।

রুস্তম বিস্মিতভাবে বলল, কেন ? সঞ্জীবওয়া তাকে বুঝিয়ে বলল, তোমাকে হাতীর বাচ্চা মনে করে কেউ তুলে নিয়ে যাবে।

একথায় সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠলো। মাটিতে শুয়ে থাকা বিষ্ণুকে সুখো বলল, তুমি আমাদের মধ্যে বয়স্ক, সবার চাইতে তাগড়া, তুমি আমাদের নেতা হও।

বিষ্ণু রাশভারী কণ্ঠে বলল, এখন আমার ঘুম পাচ্ছে, তোমরা সবাই যাও, ফিরে এসে কি দেখেছ সে সম্পর্কে আমাকে রিপোর্ট দেবে।

সঞ্জীবওয়া বলল, এমনভাবে কথা বলছে যেন রাজপুত্তুর।

সুখো মধ্যস্থতা করে বলল, যেতে দাও, বিষ্ণু ছাড়াও আমাদের চলবে। আমরা যেতে পারব। বিষ্ণু বরং এদিকে থেকে অন্য ছেলেদের পাহারা দেয়ার কাজ করবে।

বিষ্ণু গা বাঁচিয়ে বলল, না, আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি কোন কাজ করব না। এই বলে সে পাশ ফিরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সুখো ও তার সাথীরা এগিয়ে চলল। যতোই এগিয়ে যাচ্ছিল ছোট ছোট ঝোপঝাড় ছাড়িয়ে ঘন অরণ্য দেখা যাচ্ছিল। বড় বড় গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবুজ পাতায় ছেয়ে যাওয়া ঘন অরণ্যে সূর্যের কিরণকেও যেন সবুজ মনে হচ্ছিল।

এ যাবত সুখো কোন অরণ্য দেখেনি, বোম্বের বাইরে সে কখনো যায়নি এ কারণে এ অরণ্যের সবকিছু তার কাছে নতুন লাগছিল। গভীর অনুসন্ধিৎসায় সে সবার আগে আগে হাঁটছিল। হঠাৎ কে যেন তার জামা ধরে তাকে পিছনে টেনে আনল। সুখোর সামনে একটা গাছের শাখা জোরে জোরে দুলছে। সভয়ে তাকিয়ে সুখো দেখলো যেটাকে সে গাছের শাখা মনে করে হাত বাড়াতে যাচ্ছিল সেটা আসলে একটা বিরাট সাপ।

জামু বলল এটা একটা অজগর। এই অজগর তার দেহের চারগুণ বড় জন্তুকেও অনায়াসে কাবু করে ফেলতে পারে, হাড় মাংস গিলে খেতে পারে।

গোপাল সিং বললো সাবধানে হাঁটো, জামুকে সবার আগে হাঁটতে দাও। বনজঙ্গল সম্পর্কে তার ভালো অভিজ্ঞতা আছে।

তারপর জামুর পেছনে অন্যান্য ছেলেরা সতর্কভাবে এদিক ওদিক তাকিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ কাছের একটা ঝোপের মধ্যে কি যেন নড়ে উঠল। সুখো বললো বাঘ নিশ্চয়ই।

জামু ঠোঁট বরাবর আঙুল উঠিয়ে সবাইকে চুপ্ করার ইঙ্গিত করলো। এ সময়ে কি একটা সাদা মত দেখে তারা ভাবল কোন পশুর লেজ হবে! কিন্তু পশুর লেজতো নয়। তারা বিস্ময়ভরে তাকিয়ে দেখল সুধা দাঁড়িয়ে হাসছে।

জামু বিস্মিত স্বরে বলল, সুধা, তুমি?

গোলাপ ক্রুদ্ধভাবে বললো, তুমি এসেছ কেন?

কাসেম বললো, মেয়েদের জঙ্গলে কি কাজ?

সুধা জবাব দিল, আমি আমার ভাই এবং মেয়েদের পক্ষ থেকে এসেছি।

কাসেম বলল, কিন্তু----

কথা শেষ না হতেই বসন্ত বললো, মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে আমরা জঙ্গলে যাব না।

সুধা বসন্তের মুখের উপর জবাব দিল, তোমাকে নিয়ে যেতে হবে না, আমি নিজেই যেতে পারব। এই বলে সুধা বসন্তের দিকে জিহবা বের করে তাকে ভেংচি দিল।

সুখো বলল, ঠিক আছে, ওকে আসতে দাও নাহলে ওকে সাথে নিয়ে কাউকে আবার ফিরে যেতে হবে। অথচ আমাদের এখনই পাহাড়ে যাওয়া দরকার।

সাথে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে সুধা খুব খুশি হলো। সে সুখো ও বসন্তের পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলো। তারা যতই এগিয়ে যাচ্ছিল কোথাও জনবসতি, গ্রাম, এমনকি মানুষের পদচিহ্ন দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। চারদিকে গভীর ঘন জঙ্গল। কোথাও গাছের শাখায় তোতা পাখী পাখা মেলে টিঁ টিঁ শব্দে উড়ে যায়, কোথাও চড়ুই পাখিদের হল্লা করতে দেখা গেল। কোথাও বা লম্বা লেজ ঝুলিয়ে একদল বানর গাছের ডালে বসে বন্য ফল খাচ্ছে। জনবসতি থেকে দূরে সে এক পৃথক পৃথিবী। তারা যতোই এগিয়ে যাচ্ছিল বনের ততোই গহীন অরণ্যে গিয়ে পৌঁছাচ্ছিল। চিড়িয়াখানায় ওরা যেসব পশু দেখছিল এখানে তাদের অবাধে বিচরণ করতে দেখলো, ঠিক মানব সমাজে মানুষ যেমন বিচরণ করে তেমনি। ইরানী

গালিচার মতো নরম ও মোলায়েম সবুজ দূর্বাঘাস। বাঁশ ঝাড়ের নিচে এক পাল হরিণ এদের দিকে চকিতে তাকিয়েই অদৃশ্য হয়ে গেল। একটা বন-বিড়ালের চিৎকারের শব্দ শোনা গেল, মুহূর্তের জন্য ওদের নীল নীল চোখও ওদের সামনে ভেসে উঠলো। চলার পথে ওরা আরো নানা রঙের পশু ও পাখি দেখতে পেলো।

পাহাড়ে অর্ধেক ওঠার পর বন এতো ঘন হয়ে এলো যে সামনে পা বাড়ানো কষ্টকর হয়ে উঠলো। কারো কারো কাপড় ছিঁড়ে গেল, পায়ে ও হাতে কাঁটার আঁচড়ের দাগ পড়ে গেল। তবু তারা সাহস করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলো। কিন্তু এখন সামনের দিকে যাওয়া শুধু কষ্টকর নয় রীতিমত অসম্ভব। অবস্থা বেগতিক দেখে সবাই গিয়ে জামুর দিকে তাকালো। জামু একটা গাছের মাথায় উঠে তার সাহায্যে অন্য গাছে চলে গেল, সেটি থেকে আর একটিতে গিয়ে উঠলো---এভাবে পর পর কয়েকটি গাছ বেয়ে দোল খেল। মুখে তার নানা রকম শব্দ। তার দেখাদেখি অন্যরাও গাছের শাখায় আরোহণ করলো এবং নতুন শব্দ ও শিস দিয়ে বন মুখরিত করে তুললো। পাখীরা উড়ে উড়ে হৈ চৈ জুড়ে দিল। লম্বা লেজ-ওয়ালা বানরগুলো ওদের সঙ্গে মিতালী পাতাতে চাইছে। এক সময়ে পাহাড় চূড়ায় উঠে চারদিকে তাকিয়ে তারা অবাক হলো, আশা করেছিল গোয়া বা অন্য কোন জনবসতির সন্ধান পাবে কিন্তু সে আশা বৃথা। তারা দেখল চারদিকে ঘন জঙ্গল, মাঝে মাঝে উঁচু উঁচু পাহাড়। দূরে দিগন্তবিস্তৃত সমুদ্রের নীল কালো জলরাশি ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

দীর্ঘক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে তারা এ দৃশ্য দেখলো। কিছু দূরে নিম্ন এলাকায় সুধা একটা দুর্গের মত জিনিস দেখে বলল, দেখ দেখ একটা ভূতের দুর্গ।

ওটা হয় ভূতের নয়তো পরীদের দুর্গ---সুধা বলল।

কাসেম সন্দিগ্ধভাবে বলল, ডাকাতদের আস্তানাও হতে পারে।

বসন্ত বলল, চল উপকূলে ফিরে যাই। গোপাল আপত্তি করে বলল, সেখানে কি আমাদের মা বসে আছে যে, গেলেই দুধ জিলিপি খেতে দেবে? বুদ্ধিমানের মতো কথা বলো। এতো পথ এসে পেছনে কেন ফিরে যাব?

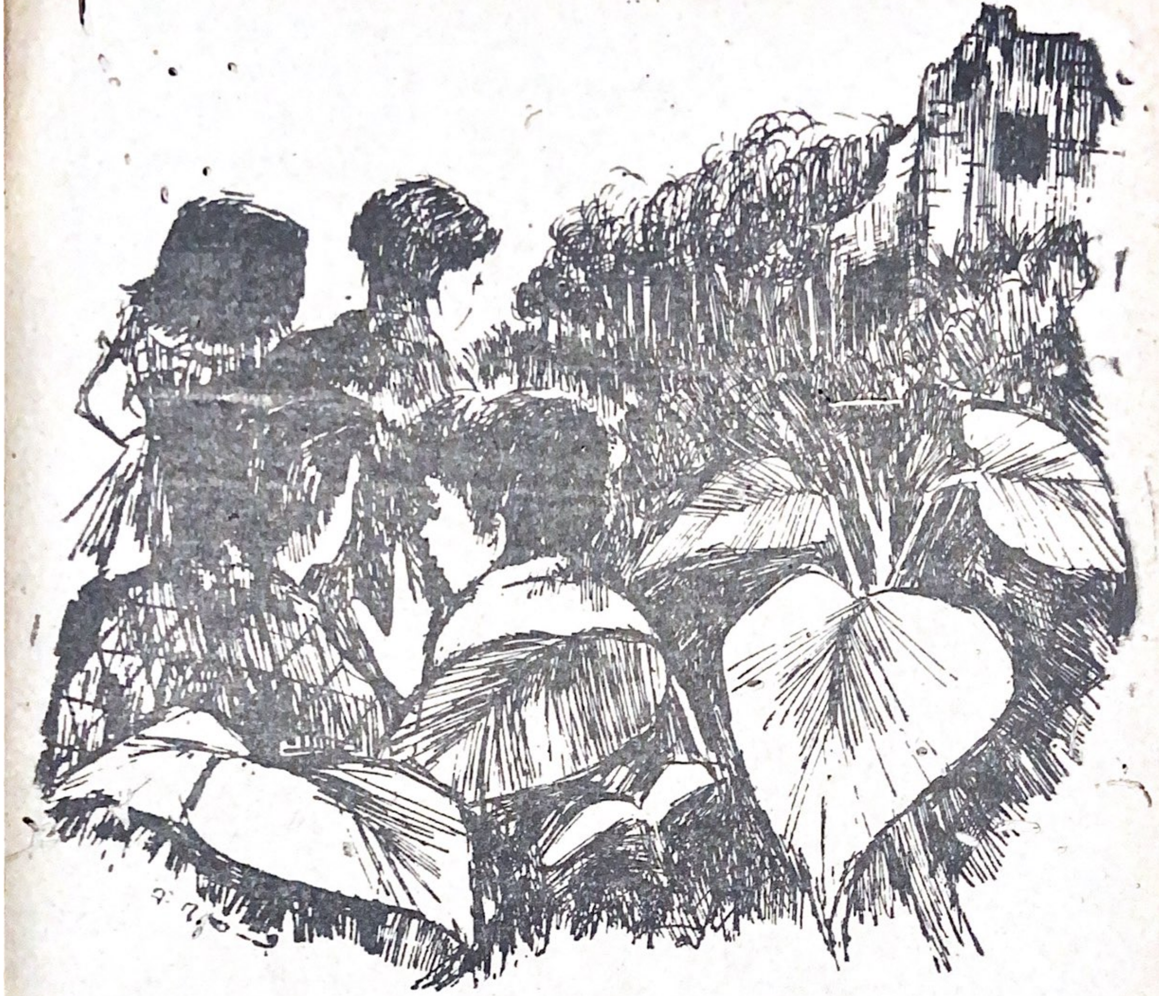

সুখো গোপালকে সমর্থন জানিয়ে বলল, যেখানে দুর্গ আছে সেখানে দেয়াল আছে, ছাদ আছে, কোন মানুষও অবশ্যই আছে, আর যদি মানুষ পাই তবে আমরা তাদের নিকট থেকে সাহায্য পেতে পারি।

কাসেম বলল, সুখো ঠিকই বলেছে।

সুধা বলল, যেসব সাথীকে আমরা রেখে এসেছি ওদের কি হবে?

তারপর সিদ্ধান্ত হলো যে, জামু এবং গোপাল ফিরে যাবে এবং অন্য সব ছেলে-মেয়েদের এখানে নিয়ে আসবে। এখান থেকে সবাই একত্রিত হয়ে দুর্গ অভিমুখে রওয়ানা হবে।

সূর্য পশ্চিম দিকে অনেকটুকু ঢলে পড়েছে। ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে দুর্গের সামনে গিয়ে পেঁছালো।

অনেক দিনের পুরনো দুর্গ। চারদিকে রহস্যময় মৃত্যুশতল নীরবতা। দুর্গের ধারে কোন জনমানবের চিহ্ন না দেখে জীর্ণ ভগ্ন সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে বন্ধ দরজার কড়া নাড়লো। কিন্তু কোন শব্দ হলো না বরং দরজাটা আপনা আপনি খুলে গেল। দরজা খোলার পরই সবাই সভয়ে কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে আবার সামনে অগ্রসর হলো।

ওরা দেখলো যে, দুর্গটি ভেতরে দিকে ভগ্নপ্রায়, ছাদ নেই বললেই চলে, দেয়াল স্থানে স্থানে ধসে গেছে। স্তুপীকৃত চুন-সুরকি পড়ে আছে। সে সব স্তপে পরগাছা জন্ম নিয়েছে। তার কোন কোনটিতে পাখীরা বাসা বেঁধেছে। যে সব দেয়াল দাঁড়ানো রয়েছে সেগুলোর অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। বহু বছর এখানে যে কেউ থাকেনি এটা দুর্গের ভেতর তাকালেই বোঝা যায়। সামনের অংশ দূরে থেকে ভালোই মনে হয়। সমুদ্রের দিকে দুর্গের পেছনের অংশ বহু আগেই বিধ্বস্ত হয়ে গেছে।

দুর্গের ভেতরের অবস্থা দেখে ওরা সবাই হতাশ হলো। পাহাড় চূড়া থেকে দুর্গ আবিষ্কারের পর তারা কতো কিছু কল্পনা করেছিল কিন্তু সব আশা নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। তারা বিস্ময়বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। হঠাৎ সুখোর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, সবাই তাকিয়ে দেখল সুখো সবাইকে ইশারায় ডাকছে। দুর্গ ফটক থেকে বেশ কিছু যাবার পর তারা দেখল সুখো তিনদিকে দেয়াল বিশিষ্ট একটা কামরা আবিষ্কার করেছে, কামরাটির ছাদের কিছু অংশও অবশিষ্ট রয়েছে। সুখো সবাইকে বলল, ঘুমোবার জন্য এ জায়গা কেমন হবে? তিন দিকে দেয়াল আছে। কাসেম বলল, হাঁ, আর দেয়ালগুলোও বেশ উঁচু, কোন জীব-জন্তু আসতে পারবে না।

জামু আশংকা প্রকাশ করে বলল, কিন্তু চতুর্থ দিকে কি করবে?

সুখো বলল, সেদিকে পাহারাদার বসিয়ে দেব।

কাসেম জিজ্ঞেস করল, রাতে পাহারা দেবে কে?

সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত, শংকর মুখার্জী, রুস্তম ও রঙ্গা মুন্সি পাহারা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হল। সুধা তার বড় ভাইয়ের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, আমরা দুজনও পাহারা দেব।

কিন্তু বিষ্ণু ঘুমের বাহানা করে পাহারা দিতে অস্বীকৃতি জানালো।

সুখো বলল, ঠিক আছে, দরকার নেই, অনেক পাহারাদার হয়ে গেছে। আজকে আমি ও শংকর প্রথমে চার ঘন্টা পাহারা দেব, পরে রুস্তম ও বসন্ত চার ঘন্টা পাহারা দেবে, বাকি সবাই ঘুমুবে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল। ধূলি ঢাকা মেঝে পরিষ্কার করে তারা সেখানে শুয়ে পড়ল।

ভয়ানক নিস্তব্ধ কালো রাত্রি। ভগ্ন ছাদের ফাঁক দিয়ে আকাশের তারকা দেখা যায়। দূরে কোথায় যেন বাঘ গর্জন করছে। সে আওয়াজ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ওরা ছিল খুবই ক্লান্ত, এজন্য শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে গেল। কোথায় ঘুমোল, কোথায় এলো কিছুই তাদের মনে পড়ল না। ধূলো মাটির বিছানাই তাদের কাছে চমৎকার সুখপ্রদ মনে হল।

রাতের নীরবতায় পালা করে ওরা পাহারা দিল। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। এই অন্ধকারের ভেতর ভগ্ন ছাদের পাশ থেকে দুটি বড় লাল চোখ কয়েক মিনিটের জন্য চমকেই আঁধারে মিলিয়ে গেল।

যারা পাহারা দিচ্ছিল তারা সে চোখ দেখতে পায়নি।

পরদিন মেয়েদের দুর্গে রেখে ছেলেরা জঙ্গলের দিকে যাত্রা করল। তাদেরকে খাবার জিনিস সংগ্রহ করতে হবে। মেয়েদের বলা হল তারা যেন দুর্গের মধ্যে থাকে, বড় জোর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়---। দূরে কোথাও না যায়।

কিন্তু ছেলেদের চলে যাওয়ার পর মেয়েরা এক জোটে নিকটে প্রবাহিত নদীতে নেমে দীর্ঘক্ষণ ধরে গোসল করলো। তারা একে অন্যের গায়ে পানি ছিটিয়ে উল্লাস প্রকাশ করলো। কেউ কেউ নদীর তীরে বনফুল তুলতে লাগল। যারা নদীতে নেমেছিল, নেয়ে এসে তারা সবুজ ঘাসে পা ছড়িয়ে শুয়ে রোদ পোহাতে লাগল।

ফুল তুলতে তুলতে হঠাৎ সুধা আনন্দে চিৎকার করে উঠল।

কি হল? হোসনা জিজ্ঞেস করল।

সুধা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, মটর—মটর শুঁটি। একটা ঝোপের কাছে প্রচুর মটর শুঁটি ছড়িয়ে আছে, একটা ছিঁড়ে নিয়ে সুধা হোসনাকে দেখাল। মুখে দিতে যাবে এমন সময় হোসনা তাকে বাধা দিয়ে বলল, রাখো, আগে মিস বাটিনিকে জিজ্ঞেস করে নেই, বিষাক্ত কিনা কে জানে!

যাকে মিস বাটিনি বলা হলো তার আসল নাম যমুনা। স্কুলে বোটানিতে যমুনা সব সময়ে প্রথম হতো এজন্য তাকে এ নাম দেয়া হয়েছে। সব মেয়ে তাকে মিস বাটিনি বলে ডাকতো।

হালকা পাতলা গড়নের যমুনা চোখে চশমা পরে। এত অল্প বয়সেও তাকে গম্ভীর দেখায়। মুরুব্বির মত মনে হয়। অনুসন্ধিৎসু চোখে সে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সুধা তাকে ডাকলে সে ধীরে ধীরে এদিক এলো, তার হাতে কাঁচের মতো দু'তিনটি পাথরের টুকরো।

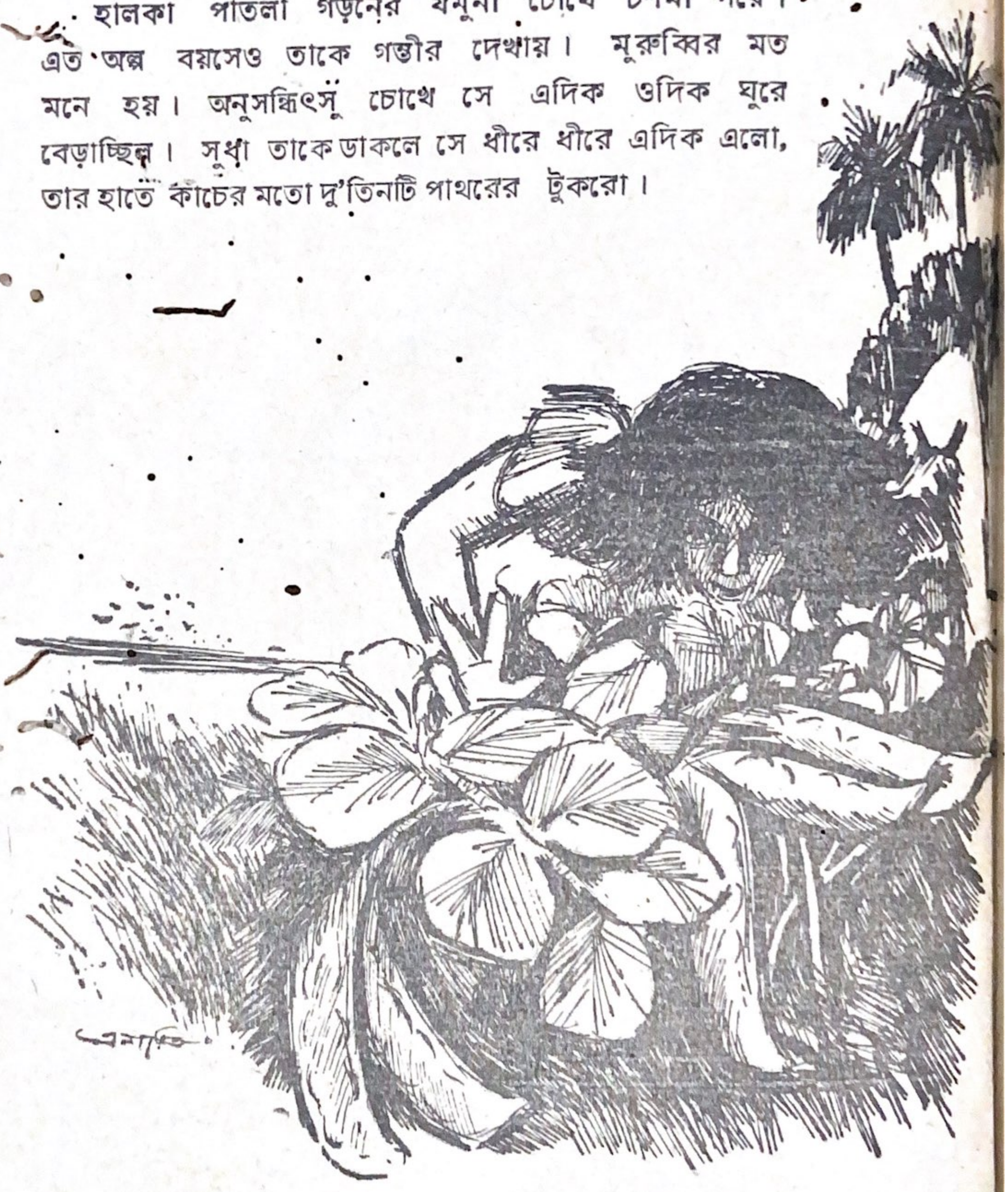

যমুনা মটর শুঁটি ভাল করে পরীক্ষা করে বলল, হাঁ এগুলো মটরই, অন্য কিছু নয়, খেতে পার। মেয়েরা সবাই তখন হুমড়ি খেয়ে পড়ল, অল্পক্ষণের মধ্যে সেগুলো শেষ করে আশেপাশে অনুরূপ মটর ঝোপ খুঁজতে লাগল। ক্ষুধার তাড়নায় তারা মটর শুঁটি কাঁচা খেতে খেতেই কথা বলছিল।

তারপর যমুনা সুধাকে নিয়ে নদী তীরে চলে গেল। ছোট নদী, সামান্য একহাঁটু পানি। নদীর ওপারে গিয়ে আরো কিছু বনজ খাবার সংগ্রহ করে ফিরে এল।

দুপুরে ছেলেরা ফিরে এল। ওরা বহু কিছু নিয়ে এসেছিল এবং নতুন তথ্য জেনে এসেছিল। মেয়েদের কাছে এসেই তারা আনন্দে আটখানা হয়ে বলল, দেখ, দেখ কি এনেছি! বন-আনার, বন-সেব ছোট ছোট কিন্তু খুবই টক।

ওরা বনে কলার দুটো কাঁদিও আবিষ্কার করেছিল। একটি কাঁদি থেকে কয়েকটা কাঁচা কলা নিয়ে এসেছিল। কৃতিত্বের সাথে প্রতিটি জিনিস দেখানোর পর কাসেম ব্যঙ্গকরে বলল, আর তোমরা মেয়েরা কি করেছ? বসে বসে গল্প করেছ আর অন্যের মাথায় উকুন বেছেছ।

হোসনা হেসে বলল, জ্বী না সাহেব, জ্বী না।

মেরী বলল, দেখো এগুলো কি!

উঁহ ও-তো ফুল। ফুল মেয়েদের বরাবরই পছন্দ। এখন কি ফুল খাবে নাকি? ---কাসেম বলল।

সুধা তাকে জবাব দিল, খাবার জন্য তোমাদের টক সেব-এর চেয়ে ভাল জিনিস আমরা খুঁজে এনেছি।

সুখো বলল, কি এনেছ, আমাদের মাথা?

সুধা রেগে গিয়ে বলল, তোমাদের মাথায় যদি মটর দানার সমান বুদ্ধিও থাকত তবে বুঝতে এগুলো কি। এই বলে সুধা সবার সামনে তার দোপাট্টার আঁচল মেলে ধরল।

সুখো আনন্দে চিৎকার করে সামনের দিকে এগুলো কিন্তু ওকে তার আঁচলে হাত লাগাতে দিল না, পেছনের দিকে সরিয়ে নিল।

মিস বাটিনিওয়ালাও একটা নতুন ধরনের বন্য ফল দেখাল।

গোপাল সিং বলল, ওগুলো কোন বিষাক্ত ফল হবে।

বাটিনিওয়ালা বলল, জ্বী না সাহেব এর নাম মুংফল।

—মুংফল! বসন্ত বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল।

যমুনা ফলের শিকড় ছিঁড়ে ফেলে বসন্তের দিকে একটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, বিশ্বাস না হলে খেয়ে দেখ।

মটর শুঁটি এবং মুংফল দেখিয়ে মেয়েরা বাজিমাত করে ফেলল।

হোসনা সবাইকে মটরশুঁটি ভাগ করে দিল।

ছেলেরা খেতে খেতে বলল, একটু লবণ হলে কি যে ভাল লাগত !

পাওয়া গেল। যমুনা একটা কাঁচের টুকরোর মত চমকান পাথর বের করে বলল, দুর্গের ও-পাশের মাঠে পেয়েছি, এক্ষুণি গুঁড়ো করে দিচ্ছি।

তারপর লবণ মিশিয়ে ওরা মটর শুঁটি খেতে লাগল। মেরী বলল, ইস যদি কোথাও আগুন পাওয়া যেত।

তার ব্যবস্থা করছি। জামু বনে খাদ্য সংগ্রহের সময় দুটো চকমকি পাথর সংগ্রহ করেছিল। সে পাথর পরস্পরের সাথে ঘর্ষণ করলে আগুন জ্বলে ওঠে। অল্পক্ষণের মধ্যে জামু পাথর থেকে আগুন জ্বালাল, এটা সে তার আব্বার নিকট থেকে শিখেছিল। আগুন জ্বলে উঠলে তাতে ছোট ছোট কাঠ ফেলে দেয়া হল। ধীরে ধীরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। ওরা সবাই মটর শুঁটি আগুনে সেঁকে সেঁকে খেতে লাগল।

বিষ্ণু বলল, এটাকে বলে আসল পিকনিক।

সেদিন রাতেও ওরা আগের দিনের কামরায় গিয়ে রাত কাটালে। ছেলেরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে ক্রমে পাহারার কাজ করল।

মধ্য রাতের কাছাকাছি সময়ে রুস্তম পাহারা দিচ্ছিল। এ সময়ে সে ভাঙ্গা ছাদের দিকে তাকাল। সেখানে জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দুটো জ্বলন্ত চোখ দেখতে পেল। রুস্তম দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সুখো একটু দূরে ছিল। তাকেও জানানো হল। ভয়ে তাদের সবাই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে যাওয়ার মত অবস্থা হল।

তারা উপরের দিকে তাকিয়ে দেখল ভয়াবহ দুটি চোখ তাদের দিকেই তাক করা রয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে ক্রুদ্ধ গর্জনও শোনা গেল।

সুখো অগ্নিকুণ্ড থেকে একটা পোড়া জ্বলন্ত কাঠ এনে উপরের দিকে দুলিয়ে বলল, ও চিতাবাঘ, পালিয়ে যাও।

ছাদের উপর চিতাবাঘটি আরো জোরে গর্জন করল।

সুখোর চিৎকার ও চিতাবাঘের গর্জনে সবাই জেগে গেল এবং ঘুম-হারা চোখে ভয়ে কাঁপতে লাগল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা বুদ্ধি তৈরি করল। আগুনে দেয়া পোড়া জ্বলন্ত কাঠ হাতে নিয়ে সবাই উপরের দিকে তুলে নাচাতে লাগল এবং সম্মিলিতভাবে

চিৎকার জুড়ে দিল। আগুন দেখে আর চিৎকার শুনে চিতাবাঘের লালচোখ অন্ধকারে হারিয়ে গেল। পরে কিন্তু কারো চোখে আর ঘুম এল না। ভাঙা ছাদের দিকে তাকিয়ে এবং গল্প কথায় রাত কেটে গেল।

পরদিন রাতে দুর্গের পাহারা জোরদার করা হল। সারা রাত গনগনে করে আগুন জ্বালিয়ে রাখা হ'ল। তারা সিদ্ধান্ত নিল যে, দুর্গের বাইরে কোন উঁচু স্থানে তারা একটা ঘর তৈরি করবে, চারদিকে দেয়াল ছাড়াও সে ঘরে ছাদও তৈরি করবে।

কিন্তু কিভাবে ঘর তৈরি করবে? চাইলেই তো আর ঘর

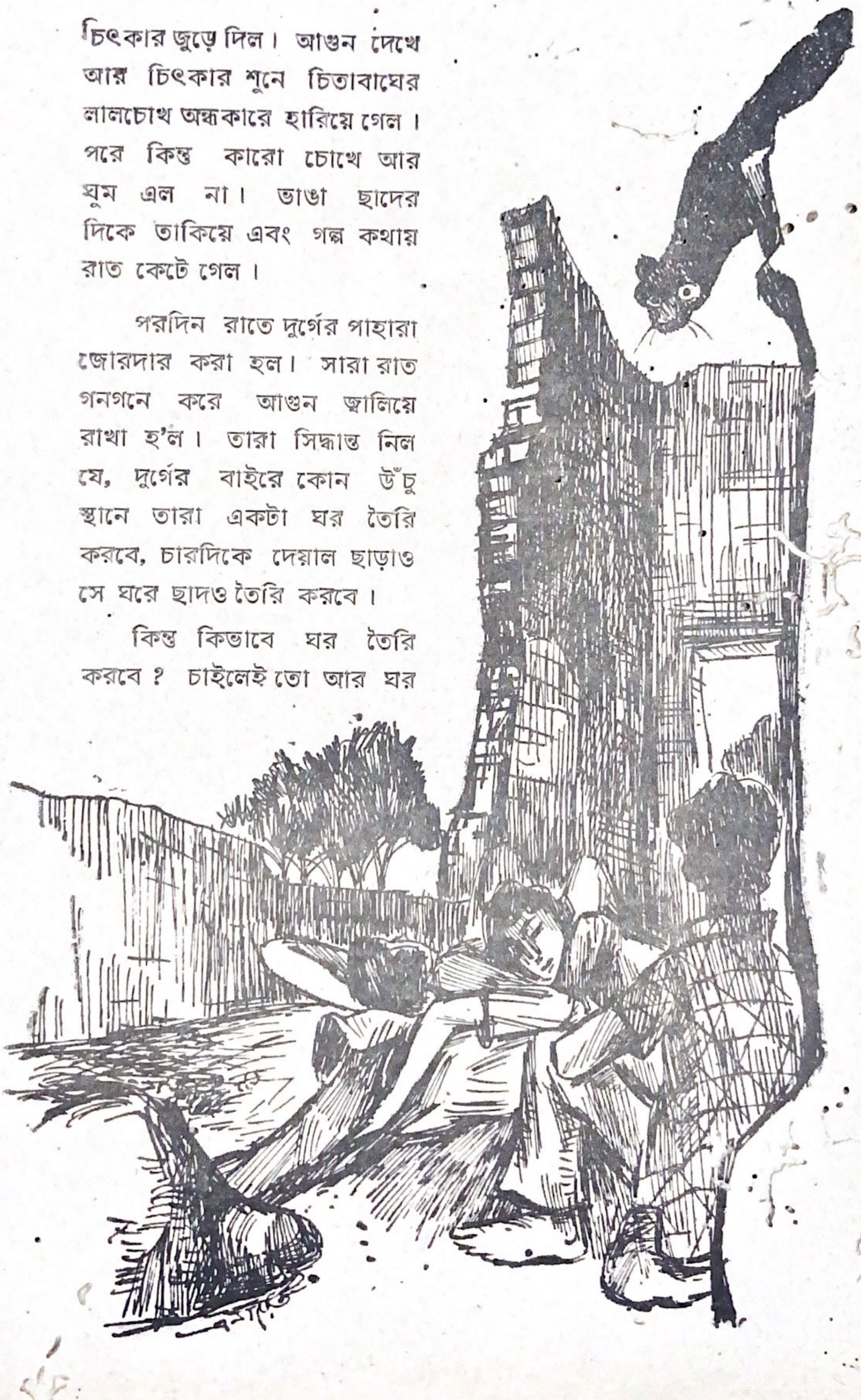

তৈরি হয়ে যায় না। তাছাড়া ওরা ছিল এ কাজে একেবারে আনাড়ি। ইট, সিমেন্ট, চুন, কিছুই নেই ঘর তৈরি হবে কিভাবে ?

জামু বলল, বোম্বে শহরের ঘরের মত ঘরতো আমরা তৈরি করব না। আমরা আদিবাসীদের মত একটা কুঁড়ে ঘর তৈরি করব।

মেরী বলল, কিন্তু কাঠ পাবে কোথায় ?

কাসেম বলল, বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করব, তা হলেই তো হবে।

গোপাল সিং বলল, কিন্তু আমাদের কাছে তো দা, কুড়ুল কিছু নেই, কাঠ কাটব কি দিয়ে ?

কাসেম তার লম্বা চাকু বের করে বলল, আমার এ খান্দানী চাকু দিয়ে ছোটখাট ডাল পালাতো কাটতে পারব।

রুস্তম বলল, আমি বড় বড় গাছের ডাল টেনেই ভেঙ্গে ফেলতে পারব।

হোসনা জিজ্ঞেস করল, কিভাবে ?

রুস্তম জবাব না দিয়ে নিকটের একটা গাছের নীচু শাখায় ঝুলে পড়ল। তার দেহের ভারে গাছের শাখা মড় মড় করে ভেঙ্গে পড়ল। রুস্তমও ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। সবাই এক সাথে হেসে উঠল। সেদিন থেকে ওরা রুস্তমকে নাম দিল কুঠার।

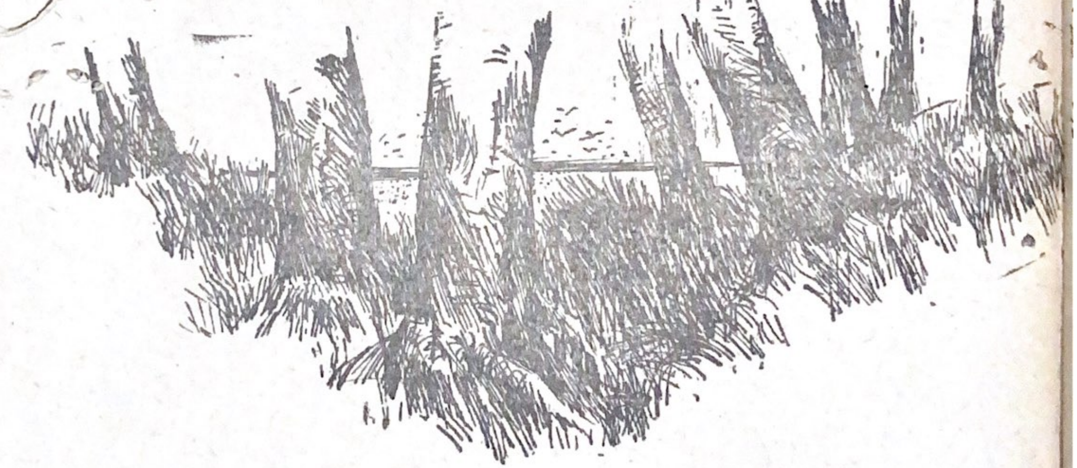

সুখো বলল, আমাদের দু'টি দলে বিভক্ত হওয়া দরকার। একদল বনে খাদ্য সংগ্রহ করবে আর এক দল ঘর তৈরি করবে।

ঘনশ্যাম বলল, খাদ্য সংগ্রহকারী দলের আমি নেতৃত্ব করব।

কাসেম বলল, এটা নেতৃত্বের শখ না ভাল খাওয়ার লোভ ?

ঘনশ্যাম ক্রুদ্ধভাবে বলল, তুই চুপ কর। কাসেম কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় মীমাংসামূলকভাবে বলল, ঠিকই হয়েছে ঘনশ্যাম,

খাদ্য সংগ্রহকারী দলের ভার তার উপরই থাকবে। আর আদিবাসী জামু ঘর তৈরির কাজে নেতৃত্ব করবে।

বসন্ত বলল, আমি নারিকেল গাছের পাতা দিয়ে ভাল ছাদ তৈরি করতে পারি। এমন পরিপাটি ছাদ তৈরি হবে যে এক ফোটা বৃষ্টিও ভেতরে যেতে পারবে না।

পরে জানা গেল, জামু, সুখো, বসন্ত ছাড়া তিনটি মেয়েও এ কাজ জানে। তারপর দুই দলে বিভক্ত হয়ে তারা কাজ শুরু করল।

ঘনশ্যাম কাসেম, গোপাল ও মিস বাটিনিওয়ালাকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে রওয়ানা হল, তখন অন্যান্য ছেলেমেয়েরা ঘর তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। প্রথমে একটা উঁচু চতুষ্কোণ জায়গা নির্ধারণ করে সেখানে পাথর জমাতে শুরু করল। তারপর মেয়েদের ঘন বন থেকে ডালপালা ভেঙ্গে আনতে বলা হল। বসন্ত কাসেমের কাছ থেকে তার চাকু চেয়ে নিয়েছিল। তারপর নারিকেল গাছে উঠে সে লম্বা লম্বা শাখাগুলো একটার পর একটা কেটে নীচে ফেলতে লাগল।

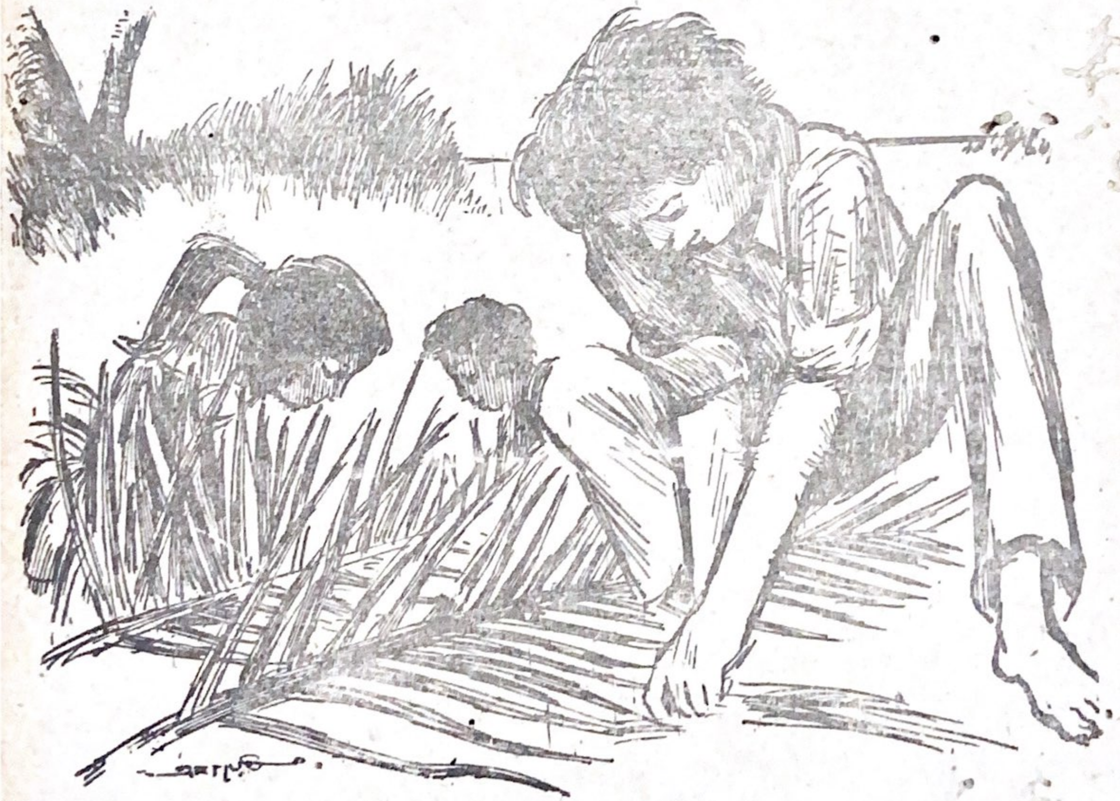

জামু, রুস্তম, সঞ্জীবওয়া ও সুধা ধারাল পাথর নিয়ে বাঁশ বনে গিয়ে কয়েকটি বাঁশ কেটে আনল, কিছু শুকনো-ডালপালাও পেয়ে গিয়েছিল। তারপর ধারালো পাথর দিয়ে মাটি খুঁড়ে সেখানে লম্বা লম্বা বাঁশ গেঁড়ে দিল। মেয়েরা নারিকেলের খোসা দিয়ে একপ্রকার রশি তৈরি করল এবং পাতা দিয়ে ছাদ ছাইতে শুরু করল। যারা এ কাজ জানত না তারা তাড়াতাড়ি শিখে নিল। কিন্তু পাথর যত ধারালোই হোক, তা দিয়ে আর কতটা কাজ চলে? ছোটখাট ডালপালা বা গাছ পাথর দিয়ে কেটে আনা যায় বটে, কিন্তু বড় বড় ডাল ও গাছতো আর কাটা যায় না। রুস্তম তার গায়ের জোর দিয়ে ছোটখাট বা মাঝারি ধরনের ডালপালা সংগ্রহ করতে পারে বটে কিন্তু বড় বড় শাখাতো কাটা সম্ভব নয়।

জামু চিন্তিতভাবে বলল, অন্য কিছু হোক না হোক ঘরের মাঝামাঝি একটা মোটা খুঁটি পুঁততেই হবে, সে খুঁটিকে কেন্দ্র করেইতো ঘর গড়ে উঠবে। মাঝখানের খুঁটি ছাড়া চারদিকে চারটা খুঁটি পুঁততেই হবে। তার পাশে নারকেলের রশি ও পাতা দিয়ে দেয়াল তৈরি করা হবে। মাঝে মাঝে বাঁশের টুকরো বেঁধে দেয়া হবে। সবই করা হবে, কিন্তু পাঁচটা মোটা খুঁটি কিভাবে জোগাড় করা যাবে।

সুধা উদ্বিগ্নভাবে বলল, সে খুঁটি ছাড়া কি ঘর তৈরি করা সম্ভব নয়?

জামু বলল, তা সম্ভব, ঘর তৈরি হবে কিন্তু মজবুত হবে না।

সুধা বলল, যে'রকমই হোক তৈরি কর, ঘরতো হবে একটা। অন্তত প্রতি রাতে চিতাবাঘের ভয়তো আর থাকবে না এবং ছাদতো ঝরে ঝরে পড়বে না।

জামু কোন জবাব দিল না।

দুপুর পর্যন্ত তারা গৃহ তৈরির যোগাড় করা যাবতীয় সরঞ্জাম একত্রিত করে ফেলল।

এ সময়ে ঘনশ্যাম ও তার সাথীরা আনন্দে কলরব করতে করতে ছুটে এল। ওরা দু'টো কলার কাঁদি আবিষ্কার করে অনেক কলা নিয়ে এসেছে। মিস বাটিনিওয়ালা একটা নতুন ধরনের ফল নিয়ে

এসেছে। বাইরের অংশ বেশ শক্ত কিন্তু ভেতরের শাঁস বাদামের মত, ওরা সে ফলের নাম রাখল বন-বাদাম। কিন্তু খাদ্য সংগ্রহকারী দলের বিস্ময়কর আবিষ্কার হল তারা একটি কূপ চিহ্নিত করে এসেছে, ঝর্ণার মত সে কূপের দু-তৃতীয়াংশে লম্বা লম্বা ঘাস কাদা ও শেওলা জমে আছে কিন্তু এক তৃতীয়াংশের পানি খুবই মিষ্টি। সেখানে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে।

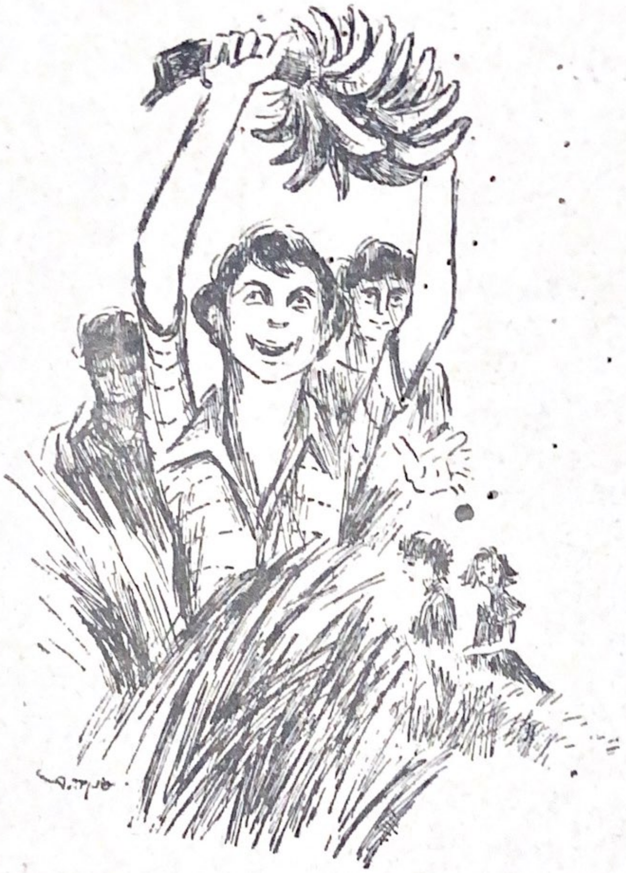

সুধা এ সংবাদে খুশী হতে পারল না। নাক সিঁটকে বলল, উঁহু একটা কূপের সন্ধান কি খুব বিরাট ব্যাপার? এ নিয়ে এত খুশী করার কি থাকতে পারে?

ঘনশ্যাম আনন্দে বুক ফুলিয়ে বলল, সে কূপেতে আমরা একটা হাতীর বাচ্চা আবিষ্কার করেছি।

হাতীর বাচ্চা? হোস্না খুশীতে চিৎকার করে উঠল।

কাসেম বলল, হাঁ, হাতীর বাচ্চা, কূপের পানিতে আটকে আছে।

হোসনা কাসেমের হাত ধরে বলল, কোথায় দেখেছ, চল আমাকে একটু দেখাও।

সব ছেলেমেয়ে কাজ কর্ম রেখে ঘনশ্যামের সাথে হাতীর বাচ্চা দেখতে রওয়ানা হল। বহুবার পথ হারিয়ে এদিক সেদিক ঘুরে এক সময়ে তারা হাতীর বাচ্চার চিৎকার লক্ষ্য করে এগিয়ে কূপ পেয়ে গেল।

হাতীর বাচ্চাটি কূপের কাদাপানিতে আটকে গেছে এবং উদ্ধার পাওয়ার জন্য চিৎকার করছে।

একজন বলল, বেচারা পানিতে ডুবেই মারা যাবে।

হোসনা বলল, ওকে বাঁচানো দরকার।

অন্য একজন বলল, ওকে উদ্ধার করতে কূপের ভিতর যে নামবে সেও ডুবে মরবে।

সুখো জামুকে বলল, যতো কিছু হোক ওকে উদ্ধার করতে হবে।

জামু এদিক ওদিক তাকাল। সুখো একটা লম্বা শুকনো লতার প্রতি ইঙ্গিত করল। সুখো জামুকে বলল, এ লতা একটা শক্ত রশির কাজে আসতে পারে।

একটা রশিতে হবে না, জামু বলল, হাতীর বাচ্চাকে উদ্ধার করতে হলে কয়েকটা রশি দরকার।

কিছুক্ষণের মধ্যে ছেলেমেয়েরা ঘর তৈরির চিন্তা ভুলে গিয়ে হাতীর বাচ্চাটি উদ্ধারের চিন্তায় মেতে উঠল। কয়েক মিনিটে ছয় সাতটি শক্ত লতা একত্রিত করা হল। তারপর জামু সতর্কভাবে পানিতে নামল। সেখান থেকে শুকনো লতাকে আংটির মতো করে হাতীর বাচ্চাটির দিকে ছুঁড়ে দিল। কিন্তু বাচ্চাটি রশিতে আটকালো না, কাদা পানিতে সাঁতার কাটতে লাগল।

সুখো দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল।

ঘনশ্যাম বলল, আমি সবার চেয়ে লম্বা, আমাকে হাতীর বাচ্চার কাছে যেতে হলে অনেক দূরে যেতে হবে, কিন্তু আমি যদি আটকা পড়ে যাই আমাকে কে উদ্ধার করবে?

সুখো বলল, তোমার কোমরে আগেই একটা রশি বেঁধে দিচ্ছি, যদি দেখি তুমি ডুবে যাচ্ছ তখনই তোমাকে তীরে টেনে নিয়ে আসব।

এ বুদ্ধি সবার পছন্দ হল। ঘনশ্যাম কাসেম ও গোপালের কোমরে রশি বেঁধে দেয়া হল। প্রত্যেককের কোমরে একটা করে রশি। ওরা পানিতে নেমে হাতীর বাচ্চাটিকে জড়িয়ে ধরে তীরের দিকে আসতে লাগল। সকলের মিলিত চেষ্টায় হাতীর বাচ্চা কাদা থেকে পানির উপরে চলে এল, তখন আর টেনে আনা কষ্টকর হল না।

কিন্তু হাতীর বাচ্চাটি কাদায় আটকে প্রথমে ভয় পেয়েছিল, এখন গলায় রশি বাঁধার পর আরো ভয় পেল, কিনারার টানতে শুরু করলে তার ভয় বেড়ে গেল। হতভাগা জানত না যে তার জীবন রক্ষারই চেষ্টা করা হচ্ছে। সে ভেবেছিল নতুন বিপদে জড়িয়ে পড়ছে এজন্য জোরে জোরে চিৎকার দিতে লাগল।

চিৎকার সত্ত্বেও ছেলেমেয়ে সবাই সর্বশক্তি নিয়োগ করে হাতীর বাচ্চাটিকে টেনে কূপের বাইরে নিয়ে এল। তারপর তারা বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে দেখতে লাগল। এ পর্যন্ত ওরা কেউ এত ছোট হাতীর বাচ্চা দেখেনি। কাদা সরিয়ে পানি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ওরা হাতীর বাচ্চাটিকে কুয়োয় স্নান গোসল করাল।

কূপের কাদা পানি থেকে উদ্ধার পেয়ে হাতীর বাচ্চাটির দেহে প্রাণ ফিরে এল। ছেলেরা তার গায়ের কাদা মুছে গোসল করিয়ে খেলা করতে শুরু করলে সে সব ভয় ভুলে খেলতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যে সে জায়গাটা ছেলেমেয়েদের আনন্দে মুখরিত হয়ে উঠল।

হঠাৎ এক বিকট চিৎকারে সবাই সচকিত হল। দেখল একটা কালো বিরাট বন্য হাতী ছুটে এসে অদূরে দাঁড়িয়ে আছে, রাগে তার লম্বা কান দুটি কাঁপছে, শুঁড় উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। তখন সুখো ছাড়া সব ছেলেমেয়ে চিৎকার করে এদিক ওদিক পালিয়ে গেল। ভয়ের চাইতে সুখো বিস্মিত হয়েছিল বেশী। শুঁড় তোলা হাতী প্রবল গর্জনে বন কাঁপিয়ে একটা পা উপরে উঠাল। মেয়েরা ভয়ে চোখ বন্ধ করে ফেলল, ছেলেরা ঝোপের আড়ালে সভয়ে তাকিয়ে রইল। ওরা ভাবলো এক্ষুণি হাতী সুখোর উপর একটা পা তুলে দিয়ে তাকে পিষ্ট করে ফেলবে।

সুখো তখন এক কাণ্ড করল। সে হাতীর বাচ্চাটিকে জড়িয়ে ধরে তার পিঠে সোহাগভরে হাত বুলাতে বুলাতে হাতীটির প্রতি তাকিয়ে বলল, আমরা তো তোমার সন্তানের জীবন রক্ষা করেছি, আমরা তো ওকে কিছু বলিনি মা! আমরাতো ওর সাথে খেলা করছি, ওকে গোসল করাচ্ছি, তোমার সন্তানতো আমাদের মতো, মা!

হাতীর বাচ্চা নির্ভয়ে সুখোর গায়ে শুঁড় বুলাতে লাগল। হাতী তখন উপরের দিকে উঠানো পা মাটিতে নামিয়ে ফেলল। তারপর নিজের সন্তানকে শুঁকে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে সুখোকে শুঁড়ের উপর তুলে নিল। ঝোপের আড়ালে লুকানো ছেলেরা ভয়ে মুখের উপর হাত রাখলো, তারা ভাবল সুখো এবার নির্ঘাত মরে গেছে। কিন্তু হাতীটি সুখোর কোন ক্ষতি করল না। সে সুখোকে শুঁড়ের উপর উঠিয়ে

তাকে পিঠের উপর বসিয়ে দিল এবং নিজের সন্তানকে আদর করতে লাগল।

সুখো কিছুক্ষণের জন্যে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। তারপর হাতীর মনোভাব বুঝতে পেরে টারজানের মতো খুশিতে চিৎকার করে উঠল।

হাতীটি তখন বাচ্চাকে নিয়ে জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হল। সুখো তার পিঠের উপর কানের কাছাকাছি শুয়ে পড়ে বলল, এদিকে নয় মা ওদিকে চল, দেখো আমরা ঘর তৈরি করছি। আমাদের ঘরে চল।

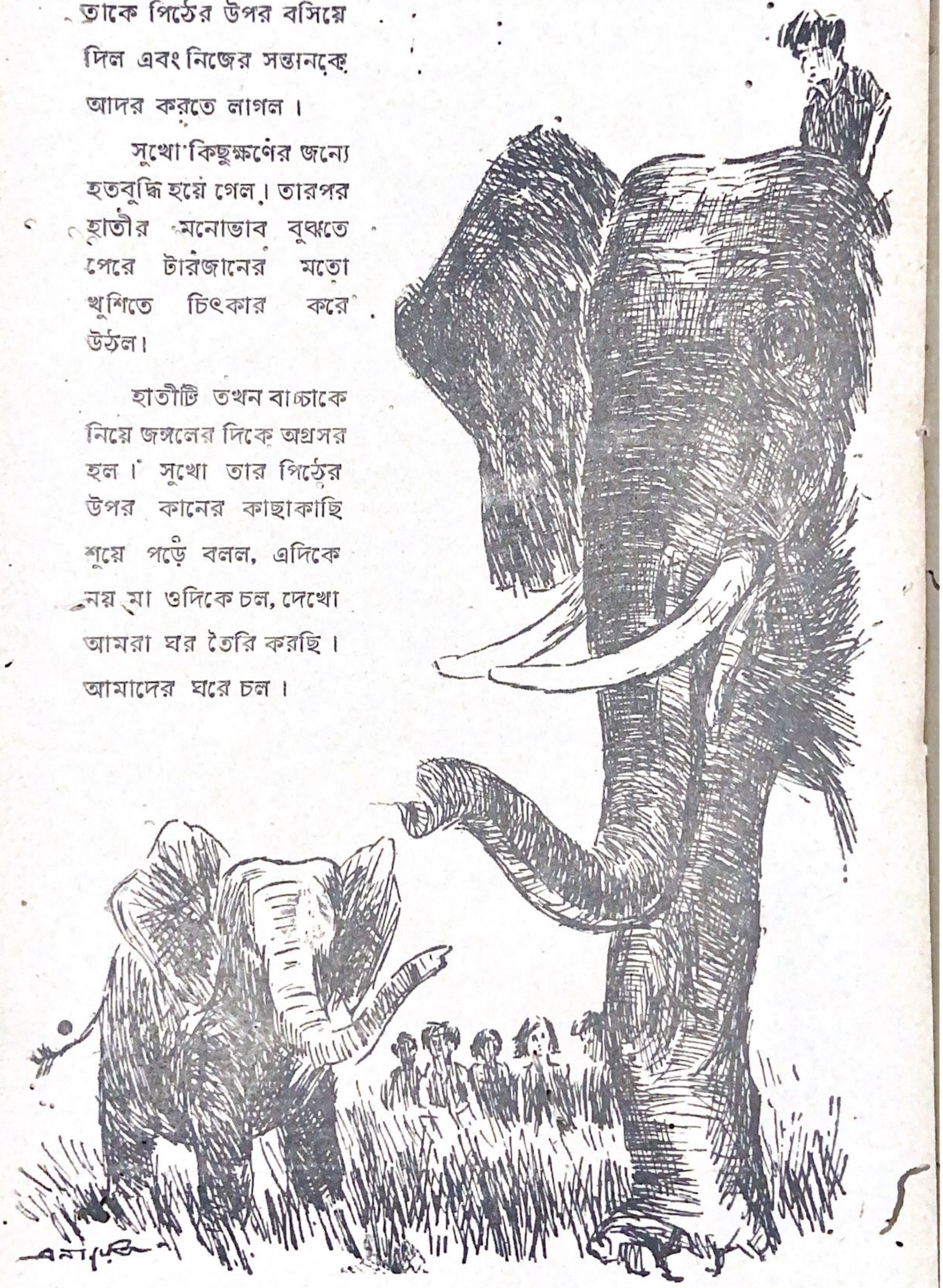

তারপর হস্তিনী সুখোর দেখিয়ে দেয়া পথ ধরে অগ্রসর হ'ল, হস্তীশাবকও তার মাকে অনুসরণ করল।

এ দৃশ্য দেখে অন্য সব ছেলেমেয়ে ঝোপের আড়াল থেকে ছুটে এল এবং হস্তিনীর পিছনে চলতে লাগল। তারা নানা প্রকার ঘাস এনে হস্তিনীর সামনে ফেলে দিল।

ঘরের কাছাকাছি এসে সুখো আবার হস্তিনীর কানে কানে বলল, ঐ দেখ মা আমরা ঐ ঘর তৈরি করছি, আমাদের মোটা মোটা খুঁটির দরকার, কিন্তু আমাদের কাছে কুঠার নেই, শক্ত সমর্থ মানুষ নেই, কিভাবে আমরা মোটা গাছ কাটবো? মা তুমি আমাদের সাহায্য কর। দেখ ঐ সামনে নারিকেল গাছ দেখা যাচ্ছে, ওটিকে ফেলে দাও, আরও দু'একটি গাছ ভেঙ্গে দাও, আমাদের ঘর তৈরি হয়ে যাবে।

সুখোর কথায় হস্তিনী কি বুঝেছে না বুঝেছে বলা যায়না কিন্তু সামনে এগিয়ে নারিকেল গাছের সাথে শক্তি পরীক্ষা করল। তারপর শুঁড় লাগিয়ে প্রবলভাবে মোচড় দিল। অল্পক্ষণের মধ্যে নারিকেল গাছ হুড়মুড় করে মাটিতে ঢলে পড়ল। ছেলেমেয়ে সবাই হাত তালি দিয়ে নাচতে শুরু করল। সুখোর ক্রমাগত অনুরোধে হস্তিনী পরপর পাঁচটি রকমারী গাছ ভেঙ্গে মাটিতে শুইয়ে দিল। তারপর শুঁড় দিয়ে সুখোকে পিঠ থেকে নামিয়ে দিয়ে নিজের শাবককে নিয়ে বনের দিকে চলে গেল। হাতীর সহযোগিতার ফলে কয়েক মাসের স্থলে কয়েক দিনে ঘরটি নির্মিত হল।

ঘর তৈরি হওয়ার পর মেয়েরা কলাপাতা শুকিয়ে জাতীয় পতাকা তৈরি করল। তারপর পতাকার গায়ে ফুল ও রঙিন পাতা লাগিয়ে একটা লম্বা কাঠিতে বেঁধে ঘরের উপর টাঙ্গিয়ে দিল। তারপর ছেলেমেয়েরা নিকটের নদীতে গোসল করে এসে ঘরের সামনে জমায়েত হল।

সর্বাগ্রে ঘনশ্যাম ঘরে প্রবেশ করতে চাইলে হোসনা তাকে বাধা দিয়ে বলল, থামো, আগে ঘরটির একটা নাম রাখতে হবে।

সুখো বলল, তা ঠিক কিন্তু এ ঘরের নাম কি রাখব?

ঘনশ্যাম বলল এ ঘর আমি তৈরি করেছি এজন্য এর নাম রাখা হোক ঘনশ্যাম প্যালেস।

রুস্তম বলল, ইস, উনি কোথাকার যেন কোন্ মহারাজ। এ ঘরের নাম হবে রুস্তম ভিলা।

বসন্ত বলল, আমি বলি বসন্ত ভবন।

কাসেম বলল, আমি বলি কাসেম মহল।

বসন্ত তার প্রস্তাবে জোর দিয়ে বলল, বসন্ত ভবন, বসন্ত ভবন, বসন্ত ভবন।

কাসেম বলল, কাসেম মহল, কাসেম মহল, কাসেম মহল।

সুধা বলল, আরে ভাই, আমার কথা তো একটু শোন।

ঘনশ্যাম বলল, হাঁ, হাঁ তুমিও বল ঘরের নাম কি হওয়া উচিত।

মেরী এরই মধ্যে প্রস্তাব করল ঘরের নাম রাখা হোক 'আমাদের ঘর।'

সুখো মেরীকে সমর্থন জানিয়ে বলল, মেরী ঠিকই বলেছে, এ ঘর আমরা সবাই মিলে তৈরি করেছি, কাজেই এর নাম রাখা হোক 'আমাদের ঘর'।

তখন সবাই সমস্বরে বলল, হাঁ 'আমাদের ঘর'।

নামকরণের পর সবাই দাঁড়িয়ে জাতীয় সঙ্গীত গাইল তারপর ঘরে প্রবেশ করল।

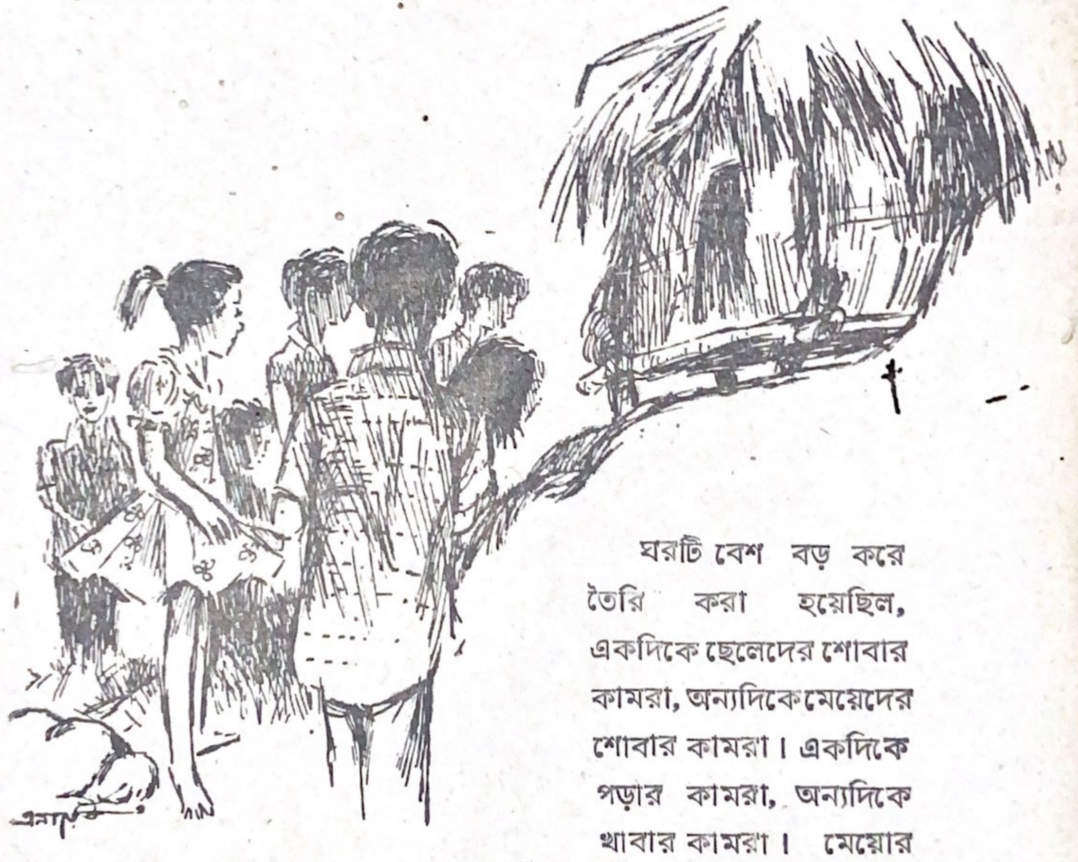

ঘরটি বেশ বড় করে তৈরি করা হয়েছিল, একদিকে ছেলেদের শোবার কামরা, অন্যদিকে মেয়েদের শোবার কামরা। একদিকে পড়ার কামরা, অন্যদিকে খাবার কামরা। মেয়েরা শুকনো কলাপাতা দিয়ে ক্যালেণ্ডার তৈরি করল, পড়ার কামরার দেয়ালে ফুল ও পাতা দিয়ে নানা প্রকার ছবি আঁকলো। আজ ঘর তৈরি হবার আনন্দে মেয়েরা মনোযোগ দিয়ে খাবার তৈরি করল। মটর শুঁটির তরকারি, মুংফলের কাবাব, চাটনি ও নারকেলের নাড়ু তৈরি করল। সবাই পেট ভরে খাবার গ্রহণ করল। খাওয়ার পর বাইরে এসে পা ছড়িয়ে দিয়ে পেটে হাত বুলাতে বুলাতে ঘুমিয়ে পড়ল।

মেরী বলল, আজ আমরা খুব খেয়েছি।

কাসেম বলল, কি বসন্ত, আজ সকলের মিলিত চেষ্টায় তৈরি খাবার খেয়ে দারুণ তৃপ্তি পেয়েছি, তাই না?

বসন্ত বলল, শুধু তৃপ্তি নয় কাসেম, দারুণ আনন্দ লাভ করেছি।

সুধা বলল, আনন্দ কোন্ আনন্দ, দেবানন্দ?

কাসেম বলল, আনন্দ নয় মজা।

বসন্ত আবার বলল, না আনন্দ।

রুস্তম বলল, রাখ রাখ বল যে, আমরা এনজয় করেছি।

বসন্ত বলল, রুস্তম আমাদের কথার মাঝখানে কথা বল না।

রুস্তম বলল, আরে ভাই, তোমরা ঝগড়া করছ দেখেই ত বললাম।

বসন্ত বলল, হাঁ হাঁ আমরা ঝগড়া করব, লড়াই করব,---এতো আমাদের জন্মগত অধিকার, কিন্তু তুমি কেন কথার মাঝে কথা বলবে?

কাসেম বলল, জন্মগত অধিকার নয়, জন্মগত প্রাপ্য।

বসন্ত বলল, প্রাপ্য নয়,---অধিকার, যদি এটা না মানিস তো তোকে আমি চাটনি বানিয়ে ছাড়ব।

কাসেম বলল, আমি তোকে আচার করে ছাড়ব।

বসন্ত বলল, বড় আমার শের খান এসে গেছে।

সুধা বলল, শের খান---কোন্ শের খান?

গোলাপ বলল, শের খান নয় শের শাহ, যিনি বাংলা থেকে কাবুল পর্যন্ত সড়ক তৈরি করিয়েছেন।

কাসেম বলল, সড়ক তো ইংরেজ তৈরি করেছে।

গোপাল বলল, আরে ও ইংরেজপুত্তুর, তুই কি মনে করিস ইংরেজ আসার আগে আমাদের দেশে সড়ক ছিল না?

কাসেম বলল, আরে নিজের চেহারা দেখ, বাঁদর কোথাকার।

গোপাল বলল, আরে বাঁদরের বাচ্চা তুই আমার বাপ তুলে গালি দিস, আমি তোর ঘাড় ভেঙে দেব।

কাসেম বলল, আমি তোর মাথা ভেঙে দেব।

রুস্তম বলল, লড়াই ঝগড়ার কি দরকার, বিজ্ঞান বইতে লিখেছে সবার বাবাই বাঁদর ছিল।

বসন্ত বলল, দেখ কাসেম, রুস্তম আমার বাবাকে বাঁদর বলেছে।

কাসেম বলল, দে লাগিয়ে একটা।

(বসন্ত ও কাসেম রুস্তমকে মারতে শুরু করে এবং ঘনশ্যামকে শব্দ করে ডাকে।)

ঘনশ্যাম বলল, ছোট ছেলের গায়ে হাত তুলতে তোদের লজ্জা করে না?

সুধা বলল, তোমার ভাই আমার ভাইকে মারছে।

হোসনা বলল, তোর ভাই তো আগে শুরু করেছে। নিজেকে খুব বড় সাধু সন্ত মনে করা হচ্ছে!

সুধা বলল, আমার ভাইকে গালি দিলি!

হোসনা বলল, আগে তোর ভাই আমার ভাইকে মেরেছে।

সুধা বলল, আগে তোর ভাই আমার ভাইকে মেরেছে, এই বলে তারা উভয়ে হাতাহাতি শুরু করে।

মেরী গোরীর কাছে গিয়ে বলল, এসো গোরী, আমরাও মারামারি করব।

গোরী বলল, হাঁ তুই আমাকে মার, আমি তোকে মারি।

বসন্ত বলল, ঘনশ্যাম বাঁচাও, বাঁচাও।

সুখো বলল, এই বসন্ত, এই কাসেম, মারামারি করিসনে। সুধা হোসনা কি করিস, কি করিস, মারামারি করিসনে। আমি বলি, মারামারি করিসনে।

তুমুল মারামারি চলছে। কাসেম ও ঘনশ্যামের মধ্যে, বসন্ত ও গোপালের মধ্যে মারামারি হচ্ছে। দুটো ছেলে রুস্তমকে মারছে। মেয়েরা একে অন্যকে নাজেহাল করছে। হৈ চৈ চিৎকার কিছুই শোনা যাচ্ছে না, কেউ কিছু শুনছে না।

হঠাৎ সুখো ওদের মারামারি করতে নিষেধ করে নীরব হয়ে রইল। কেউ তার কথা না শোনায় হতাশ হয়ে সে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে খুশীতে চিৎকার করে উঠল ঃ স্টীমার---স্টীমার---স্টীমার

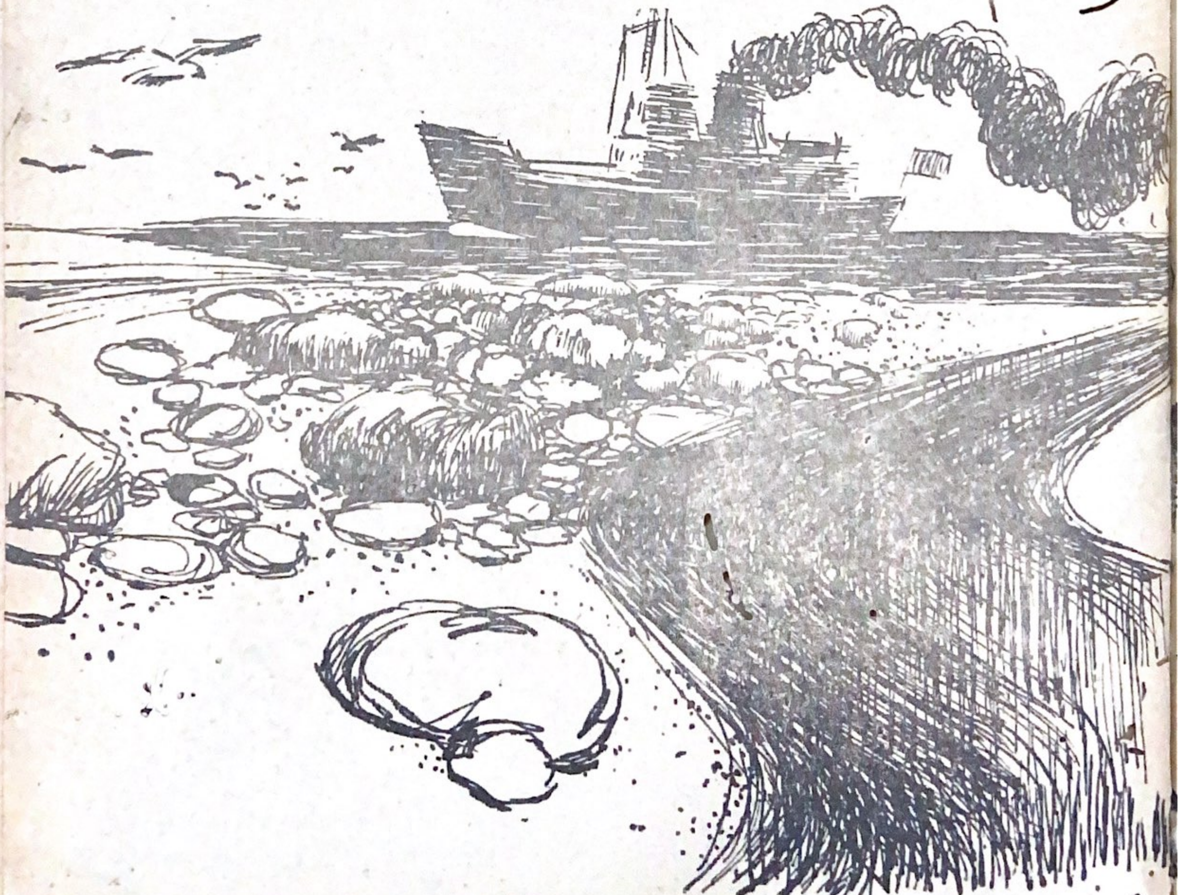

স্টীমার স্টীমার বলে সুখো সমুদ্রের তীরে ছুটে গেল, ছেলেমেয়ে সবাই মারামারি ভুলে সুখোকে অনুসরণ করল। সমুদ্রের তীরে গিয়ে ওরা একহাঁটু পানি পর্যন্ত নেমে গেল। দূরে আকাশ ও সমুদ্র যেখানে একাকার হয়ে মিশে গেছে সেখানে একটা স্টীমার দেখা যাচ্ছে। ছেলেমেয়ে সবাই চিৎকার করে ডাকল। স্টীমার, স্টীমার থামো, থেমে যাও স্টীমার। আমরা এখানে একা পড়ে আছি, আমাদের রক্ষা কর, স্টীমার আমাদের রক্ষা করো।

ঘনশ্যাম বলল, আমার বাবা বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবে, স্টীমার এদিকে এস। এদিকে এস।

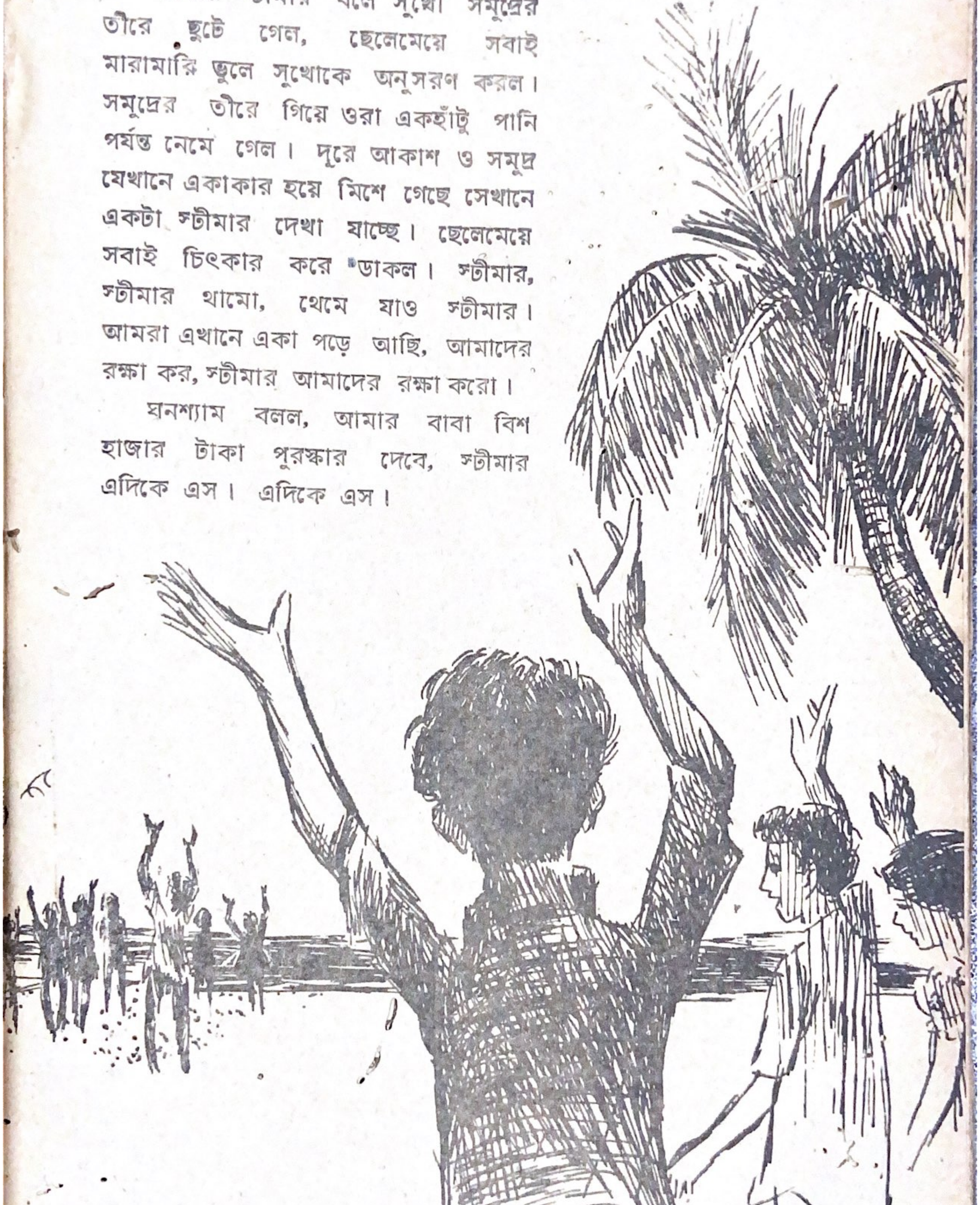

সুধা বলল, এস স্টীমার, আমাদের কাছে একবার এস।

কিন্তু স্টীমার কারও কথা শুনল না, ধীরে ধীরে দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল। পানি—অথৈ পানি ছাড়া তখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

স্টীমার চলে যাওয়ার পর ওরা পানিতে দাঁড়িয়ে রইল।

সবচেয়ে ছোট্ট মেয়ে মেরী উপুড় হয়ে মাটিতে শুয়ে কেঁদে কেঁদে বলল, স্টীমার, স্টীমার আমাকে আমার মায়ের কাছে নিয়ে চল, স্টীমার আমার মা কোথায়?

মেরী কাঁদছে। বাকি সবাই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। বিরান সমুদ্র তীরে নির্মম রোদ চক চক করছে।

ঘর তৈরি হবার পর কয়েক মাস কেটে গেল। স্কুলের ছেলে-মেয়েরা সে দ্বীপে জীবন যাপনে ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তারা সে ঘরে একটি স্কুলে খুলেছিল। স্কুলে বুদ্ধিমান এবং উপর ক্লাসের ছেলেমেয়েরা নীচের ক্লাসের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাত। মেয়েরা পড়ালেখা করা ছাড়াও পর্যায়ক্রমে রান্নাঘরের কাজ করত। দুটি ছেলে সব সময়ে কাপড় কাঁচার কাজ করত। পরিধানের কাপড় ছিঁড়ে যাওয়ার পর তারা গাছের বাকল এবং মোটা এক জাতীয় পাতা ছিঁড়ে বনফুলের রং লাগিয়ে কাপড়ের কাজ চালাত। সুইয়ের বদলে কাঁটা এবং সুতোর বদলে এক জাতীয় লতা ব্যবহার করত। সুখো লেখাপড়া ছাড়াও এখানে মুচীর কাজ করতে শুরু করেছিল। সে কাঠের চমৎকার চপ্পল তৈরি করল, সেসব চপ্পল জঙ্গলের কাঁটাভরা পথে বেশ কাজে আসত। ইতিমধ্যে সুখোর কুকুরটি বেশ বড় হয়েছে, সে এখন রাতে ঘর পাহারা দেয়।

ছেলে-মেয়ে সবাই শারীরিক পরিশ্রমে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল যেন তারা সারা জীবন এখানেই কাটিয়েছে। সব ছেলে নারিকেল গাছে ওঠা শিখেছিল। জামুর কাছে শিক্ষা লাভ করে এখন বিভিন্ন বন্য জন্তুকে তাদের শব্দ শুনেই চিনতে পারত।

বিষ্ণু কোন কাজ করত না। তার বোন সুধাকে অনেক করে বোঝানোর পরও তার মধ্যে কোন পরিবর্তন এল না। সে অন্য ছেলেদের সঙ্গে ঝগড়া করত, তাদের ভাগের খাবার কেড়ে খেত, কথায় কথায় বীরত্ব দেখাত। কিন্তু তার বোন সুধা ছিল খুব ভাল। বনে প্রায়ই কেউ তাকে কিছু বলত না। তাছাড়া ডুবন্ত জাহাজ

থেকে বিষ্ণু তার রেডিও সেট রক্ষা করেছিল, ছোট রেডিও সব সময় তার পকেটে থাকত। বিষ্ণুর রেডিও থেকে ছেলেমেয়ে সবাই, দেশ-বিদেশের খবর জানতে পারত। মজার মজার গান শুনতে পেত। এ রেডিও সেট থাকার কারণে বিষ্ণুর স্বেচ্ছাচারিতায় কেউ বড় একটা উচ্চবাচ্য করত না।

দিনরাত্রি তাদের ভালই কেটে যাচ্ছিল। সারাদিনের পরিশ্রম, ও রাতের একটানা ঘুমের কারণে কোথা দিয়ে দিন আসত যেত তারা সেটা টেরই পেত না। রাতের বেলায় ঘুমাবার সময়ে সবাই বিষ্ণুর রেডিওর পাশে জড়ো হত, এবং রেডিও স্টেশন বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত অনুষ্ঠান শুনত। এ রেড়িওর বন্ধনে লোকালয়ের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ ছিল, সব হতাশার মধ্যেও কিঞ্চিৎ আশার আলো তারা দেখতে পেয়েছিল। রেডিও শুনতে শুনতে অনেকের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত, আপনজনের নানা স্মৃতি মনের কোণে এসে ভিড় জমাত। এক সময়ে রেডিওর অনুষ্ঠান বন্ধ হয়ে যেত, সবাই তখন চোখ মুছতে মুছতে ঘুমিয়ে পড়ত। বিজন অরণ্যে সমুদ্রের গর্জন ছাড়া কিছু শোনা যেত না।

একদিন রাতের আহার শেষে সবাই বসে রেডিও শুনছিল, হঠাৎ একটা খবর শুনে চমকে উঠল। ঘোষক বলল, আকাশবাণী বোম্বে থেকে বলছি। কিছুদিন আগে সমুদ্র-ঝড়ে যেসব ছেলেমেয়ে নিখোঁজ হয়েছে বহু সন্ধান করেও তাদের কোন খোঁজ খবর পাওয়া যায় নি। আমরা সেসব ছেলেমেয়েদের নামে পর্যায়ক্রমে তাদের পিতাদের কিছু কথা পাঠাচ্ছি।

যারা এতক্ষণ অলসভাবে শুয়ে শুয়ে রেডিও শুনছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে রেডিওর কাছে এসে বসল। ঘোষকের ঘোষণার পর ঘনশ্যাম, বিষ্ণু, কাসেম, বসন্ত, বিষ্ণু ও সুধা, সুখো, হোসনা, গোলাপ, মেরী, জামু সবার পিতা সন্তানদের উদ্দেশ্যে শুভ কামনা এবং নিজেদের গভীর উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশ করল।

পরে ঘোষক আবার বলল, নিখোঁজ ছেলেমেয়েরা তোমরা যেখানেই থাক, হতাশ হয়ো না, তোমাদের ব্যাপারে যথারীতি সন্ধান চালান হচ্ছে, সম্ভাব্য সকল চেষ্টা নিয়োগ করা হয়েছে।

নিজেদের পিতার কণ্ঠস্বর ও ঘোষকের আশ্বাসে আনন্দে সবার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, তারা একে অন্যের গলা জড়িয়ে ধরে

আনন্দ প্রকাশ করল। এই প্রথমবার তারা উজ্জ্বল সুন্দর আশার আলো বুকে চেপে পরম শান্তিতে ঘুমের কোলে ঢলে পড়ল।

সেদিন রাতের পর থেকে কয়েকদিন পর্যন্ত ওরা নিশ্চিন্তে কোন কাজ করতে পারেনি। কখনো সমুদ্র-জাহাজ, কখনো উড়ো জাহাজ খুঁজে ফিরছে। পনের বিশ দিন কেটে যাবার পর যানবানহনের ব্যাপারে হতাশ হয়ে তারা আবার দ্বীপের জীবনে মনোযোগ দিতে শুরু করল। পূর্বোক্ত নিয়মে তারা দৈনিক প্রতিটি কাজ শেষ করত। কিন্তু ইতিমধ্যে তারা একটা নতুন কাজ শুরু করেছিল। দুর্গের উঁচু দেয়ালে উঠে তারা আগুন জ্বালিয়ে রাখত, যেন দূরে থেকে কেউ দেখে বুঝতে পারে এখানে মানুষ রয়েছে। আশার আলো বুকে চেপে তারা পর্যায়ক্রমে আগুন জ্বালিয়ে যেত।

একদিন সূর্যাস্তের পর সুধা, যমুনা ও হোসনা আগুন জ্বালাতে উপরে উঠছিল। সুখোর কুকুরটিও লেজ নাড়াতে নাড়াতে তাদের সাথে চলে এল। হঠাৎ কুকুরটি ঘেউ ঘেউ শুরু করল এবং পরমুহূর্তেই একটা বাঘের সাথে সংঘর্ষ শুরু করল। বাঘটি লাল চোখ মেলে হোসনার দিকে তাকিয়ে আছে এবং তাকে আক্রমণ করতে চাচ্ছে। সুধা ও যমুনা অসহায়ভাবে কাঁদছে, হোসনা থরথর করে কাঁপছে। ছেলেমেয়েরা কিছু দূরে তখন কাজ করছিল। কুকুরের আওয়াজ ও মেয়েদের কান্না শুনে গোপাল, জামু ও বসন্ত ছুটে এল। বাঘটি যতবারই হোসনার দিকে এগোতে চাচ্ছে কুকুরটি তাকে ততবারই বাধা দিচ্ছিল। বাঘটি ছিল কুকুরের চেয়ে শক্তিশালী, এজন্য আঁচড়ে কামড়ে সে কুকুরটাকে জখম করে ফেলেছিল। তবুও কুকুর কিছুতেই পিছ-পা হয়নি। গোপাল, বসন্ত ও জামু পাথর ছুঁড়ে বাঘকে আক্রমণ শুরু করল। বাঘ ততক্ষণে কুকুরের আক্রমণে এবং উপরন্তু ছেলেদের প্রস্তর বর্ষণের মুখে রণভঙ্গ দিয়ে ছুটে পালাল। এর মধ্যে কাসেম, ঘনশ্যাম, সুখোও এসে পড়েছিল। তারা মেয়েদের নিরাপদ স্থানে নামিয়ে আনল। কাসেম হোসনাকে কোলে তুলে নিল।

সুখো তাকিয়ে দেখল যে, তার কুকুরটি মারাত্মকভাবে আহত হয়েছে। নানা জায়গা থেকে রক্ত ঝরছে, পেটের নাড়িভুড়িও বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছে। সুখো তাকে কোলে তুলে নিলে তার চোখে চমক সৃষ্টি হল মনে হল, সে যেন আপন মালিককে খুঁজে পেয়েছে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পর সুখোর কাঁধে মাথা রেখে কুকুরটি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। সুখো দুর্গের বাইরের দিকে সিঁড়িতে এসে কুকুরটিকে শুইয়ে তার গালে গাল ঠেকিয়ে কাঁদতে লাগল। তারপর কয়েকজন মিলে দুর্গের সিঁড়ির পাশে কুকুরটিকে কবর দিয়ে কবরের উপর একটা বড় পাথর রেখে দিল। কবরের উপর নানা বনফুল ছড়িয়ে গভীর বেদনার্ত হৃদয়ে স্বজন হারানোর ব্যথা নিয়ে তারা ফিরে এল।

সেদিন রাতে কেউ কিছু খেল না। রেডিও শুনল না। কেউ কারও সাথে কথাও বলল না। সবার মন ছিল বেদনাভারাক্রান্ত। মৃত্যুকে তারা আজ অনেক কাছাকাছি থেকে দেখতে পেয়েছে। একটা পশু নিজের জীবন দিয়ে তাদের রক্ষা করেছে। একটা পশু তাদের আনুগত্যের ও বেঁচে থাকার শিক্ষা প্রদান করেছে। সেদিন তাদের মনে হল একদিনেই তাদের বয়স কয়েক বছর বেড়ে গেছে।

একদিন ঘনশ্যাম, মোটা রুস্তম ও বসন্ত দুর্গের একটা পরিত্যক্ত এলাকায় বসে খেলছিল। কিছুক্ষণ খেলা করার পর ঘনশ্যাম অদূরে একটা গাছে একটা শুকনো পাখীর বাসা নামিয়ে আনতে গেল। সরু ডালে চড়ে পাখীর বাসার দিকে ঝুঁকতেই মড়মড় করে ডালটি ভেঙে ঘনশ্যাম নীচে পড়ে গেল। বুদ্ধি খাটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে লাফ দেয়ায় মারাত্মকভাবে আহত হয়নি বটে কিন্তু হাঁটুতে কিছুটা আঘাত পাওয়ায় হাঁটু থেকে রক্ত বেরোতে লাগল। ক্ষতস্থানে মাটি লাগিয়ে দেয়ার জন্য একটা স্থান থেকে মাটি তুলতে গিয়ে সে একটা মুদ্রা কুড়িয়ে পেল। ঘনশ্যাম ক্ষতের যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে মুদ্রার প্রতি তাকিয়ে রইল। পরিধানের কাপড়ে ঘষে ঘষে মুদ্রার মাটি সরিয়ে দেখল একটা আস্ত স্বর্ণমুদ্রা। ততক্ষণে রুস্তম ও বসন্ত তার কাছে এসে পড়েছে। রুস্তম মুদ্রাটি দেখে আনন্দে চিৎকার করে বলল, আরে এতো দেখি আস্ত একটি আশরাফী, সোনার গিনি।

বসন্ত জিজ্ঞেস করল, কোথায় পেলে?

ঘনশ্যাম ইশারায় দেখিয়ে বলল, এই তো এখানে।

বসন্ত ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, চুপ, কারও কাছে বলিসনে।

ঘনশ্যাম বলল, চল আমরা সে জায়গা খুঁজে দেখি।

তারপর তাঁরা কাঠ দিয়ে সে জায়গার মাটি সরিয়ে প্রথমে একটা বিরাট পাথর দেখতে পেল। তিনজন এক সঙ্গে ধাক্কা দিয়ে পাথর-

খণ্ড উপরে তোলার পর দেখল নীচের দিকে খুঁটির মতো কি একটা চলে গেছে। তখন খুঁটি নাড়তে নাড়তে দেখল আশেপাশে বেশ কিছু জায়গা—নীচের দিকে সুড়ঙ্গের মত। ঘনশ্যাম সাহস করে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখল সারিবদ্ধ সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। তখন তারা একে অন্যকে নীচে যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানাল। ঘনশ্যাম কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে সুড়ঙ্গের পথ ধরে নীচে নেমে গেল। সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে বসন্তকে বলল, চলে এস। বসন্ত ঘনশ্যামকে অনুসরণ করল। তাদের দেখাদেখি রুস্তমও নেমে গেল। নীচে নামার সময়ে ঘনশ্যাম ও বসন্ত উভয়ে রুস্তমকে সাহায্য করল। বেশ কিছু নীচে নামতেই তাদের হাতে একটা কাঠের দরজা ঠেকল। দরজার পাশে দু'তিনটে নরকঙ্কাল। পাশে কয়েকখানা তলোয়ার, কুঠার ও বন্দুক। মনে হয় এখানে এক সময়ে লড়াই হ'য়েছিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ওরা দরজায় ধাক্কা দিল, কিন্তু কিছুই দেখা গেল না, ভিতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। বসন্ত পকেট থেকে চকমকি পাথর বের করে গর্তের পাশে থেকে খড়কুটো সংগ্রহ করে আগুন ধরাল। আলো জ্বালানোর পর দেখা গেল উঁচু নীচু অসমতল বিরাট কক্ষের মতো একপাশে একটা মাটির প্রদীপ পড়ে আছে। প্রদীপে হাত লাগতেই তার ভেতর থেকে একটা ইঁদুর বেরিয়ে ছুটে পালাল। মেঝেতে এখানে সেখানে মানুষের অসংখ্য হাড় পড়ে আছে। সুতরাং এখানে যে নরহত্যার ব্যাপার ঘটেছিল তাতে সন্দেহ নেই। এককালে এখানে ভীষণ লড়াই হয়ে থাকবে।

মোটা রুস্তম এসব দেখে ভয় পেয়ে গেল। কাঁপা গলায় বলল, চল এখান থেকে পালিয়ে যাই।

বসন্ত বলল, হাঁ তাই চল, ফেরা যাক। ভীষণ ভয় লাগছে।

ঘনশ্যাম তখনো সন্ধানী চোখে এদিক ওদিক তাকাচ্ছে। হঠাৎ একপাশে তাকিয়ে দেখে গণেশজীর মূর্তি। মূর্তির কপালে দেয়া সিঁদুর কালো হয়ে আছে। মূর্তির পেছন দিকে দরজার হুকের মতো কি একটা লাগল। ঘনশ্যাম হুকে হাত লাগিয়ে নাড়াতেই ঘড় ঘড় শব্দ হয়ে দরজা খুলে গেল। ভেতরে মেহরাবের মত তিনটা সিঁড়ি। তিন সিঁড়িতে পরপর তিনটা সিন্ধুক রয়েছে। একটাতে সোনার মোহর, একটাতে মূল্যবান অলংকার ও পোশাক পরিচ্ছদ, অন্য একটা হীরা জহরতে পরিপূর্ণ। তাদের চোখ ধাঁধিয়ে গেল, চারদিক আলোকিত হয়ে উঠল।

ঘনশ্যাম আনন্দে চিৎকার করে উঠল। তার দুহাতে সোনার মোহর। মুখে বিজয়ীর হাসি। সোনার মোহরে রোমান হরফে কি যেন লেখা। ঘনশ্যাম সে লেখা পড়ে বলল, আরে এতো পর্তুগীজ জলদস্যুদেরখনি।

রুস্তম হীরা জহরতের সিন্দুকের দিকে অগ্রসর হলে ঘনশ্যাম তাকে সঙ্গে সঙ্গে থামিয়ে দিল। ঘনশ্যাম বলল, এ খনি আমি আবিষ্কার করেছি এজন্য আমিই এর মালিক।

রুস্তম হতবুদ্ধি হয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘনশ্যাম বলল, তবে হাঁ, তোমরা যেহেতু আমাকে সাহায্য করেছ এজন্য তোমাদেরও অংশ দেব, কিন্তু অন্য কাউকে দেয়া হবে না।

হীরা জহরত মুক্তোর সিন্ধুকের দিকে লোভাতুর চোখে বারবার তাকিয়ে বসন্ত বলল, ঠিক আছে।

ঘনশ্যাম বলল, এ খনির কথা কারো কাছে প্রকাশ না করার ব্যাপারে শপথ করতে হবে। তাছাড়া এও শপথ করতে হবে যে, তোমরা দু'জন আমার সাথে এ খনির সংরক্ষণ করবে এবং অন্য কাউকে স্পর্শও করতে দেবে না।

বসন্ত ও রুস্তম বলল আমরা শপথ করছি।

ঘনশ্যাম বলল, আজ থেকে আমরা তিনজন একজোট। ঘনশ্যাম এক হাতে রুস্তম অন্য হাতে বসন্তকে ধরে বলল, আমি এই দ্বীপের রাজা, বসন্ত, তুমি উজির আর রুস্তম হল গিয়ে সেনাপতি।

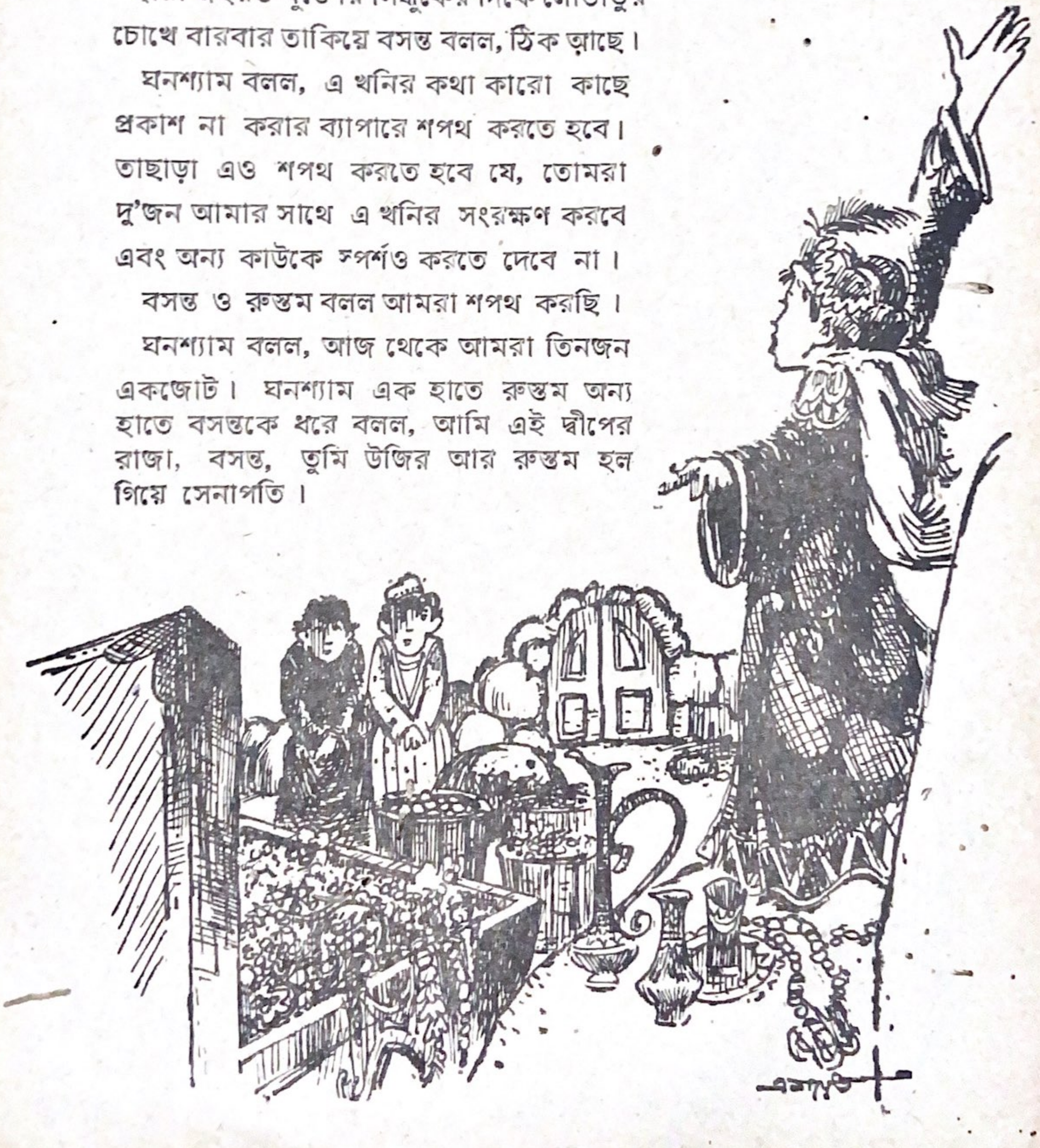

বসন্ত ও রুস্তম চিৎকার করে বলল, রাজা সাহেবের জয়।

সুড়ঙ্গ পথে বাইরে উঠে আসার পর ঘনশ্যামকে সত্যিকার রাজার মতই লাগছিল। তার গলায় মোতির মালা, আঙুলে হীরের আংটি, মাথায় এলোমেলো করে জড়ানো নানা অলংকার রাজমুকুটের মতো সাজানো। পরিধানে লাল পাজামা, একেবারে যেন রাজা সাহেব। তার ডান পাশে বসন্ত বাম পাশে রুস্তম হেঁটে চলেছে। তাদের পরনেও সুন্দর, দামী পোশাক। তবে রাজার মতো দামী নয়। বসন্তের গলায় রুস্তমের তুলনায় মুক্তোর মালা অধিক শোভা পাচ্ছে কারণ সে তো উজির।

মোটা রুস্তম হাতে একটা কুঠার নিয়ে লেফট রাইট করতে করতে সামনের দিকে এগোচ্ছে, মাঝে মাঝে বলছে, সবাই সতর্ক সবাই সাবধান মাননীয় রাজা সাহেব আসবেন।

খনিজ সম্পদ লাভের সংবাদ কিছুক্ষণের মধ্যে সব ছেলেমেয়ের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল। সবাই কাজ কর্ম ছেড়ে এদের দিকে বিস্মিত চোখে তাকিয়ে রইল। সবাই একত্রিত হ'লে উজির ও সেনাপতিকে দু'পাশে দাঁড় করিয়ে একটা উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে ঘনশ্যাম গম্ভীর স্বরে বলল, আজ থেকে আমি এই দ্বীপের অধিনায়ক। রাজা ঘনশ্যামজী দ্বীপ-ই-আজম।

জামু সুখোকে জিজ্ঞেস করল, এই দ্বীপ-ই-আজম জিনিসটা কি?

সুখো মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল, সম্ভবত মোগল-ই-আজম জাতীয় কিছু হবে।

সব ছেলেমেয়ে হাততালি দিয়ে বলল, দ্বীপ-ই-আজম জিন্দাবাদ।

ঘনশ্যাম বলল, আজ থেকে আমি তোমাদের রাজা, তোমরা আমার প্রজা, আজ থেকে আমি যা আদেশ করব তোমরা তাই করবে। কেমন, তাই না উজির? বসন্ত মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। কেমন তাই না, সেনাপতি? রুস্তম মাথা নেড়ে বলল, হাঁ হাঁ সাহেব।

ঘনশ্যাম গম্ভীর স্বরে ধমক দিয়ে বলল, জ্বি, মহারাজ, ব'ল।

কিছুদিন যাবত ছেলেরা এই নিয়ে রাজা-উজির খেলা খেলল, হৈ হুল্লোড় করল এবং রাজাজী, উজিরজী, সেনাপতিজী বলে ঘনশ্যাম, বসন্ত ও রুস্তমকে সম্বোধন করতে থাকল। কিন্তু পরে তারা বিস্ময়ের সাথে বুঝতে পারে যে, ওরা সত্যি সত্যি নিজেদের রাজা, উজির এবং সেনাপতি মনে করছে, সবাই যেটাকে তামাশা মনে করেছে

সেটা আসলে তামাশা নয়। রাজা উজির এবং সেনাপতির মত ওরা তিনজন অন্য ছেলেমেয়েদের নির্দেশ দেওয়া শুরু করেছিল।

একদিন হোসনাকে ঘনশ্যাম ডাব খাওয়াতে বলায় হোসনা বলল, আমি তোমার চাকরানী নই, তুমি নিজে গিয়ে ডাব কেটে পানি খাও।

গোপাল মহারাজের কাপড় ধুতে অস্বীকার করে বলল, তুমি তো এতদিন নিজের কাপড় নিজেই ধুয়েছ, আজ তোমার কি হয়েছে ?

ঘনশ্যাম গোপালকে ধমক দিয়ে বলল, এখন আমি রাজা, নিজের কাপড় নিজে ধুতে পারি না।

সুখো ক্রোধের সাথে বলল, নিজের কাপড় নিজে ধুতে পারবে না, নিজের খাবার নিজে খেতে পারবে না, পানি নিজে পান করতে পারবে না তুমি রাজা হয়েছ, নাকি খোঁড়া হয়েছ ?

ঘনশ্যাম খনিতে পাওয়া গাদা বন্দুক তুলে নিয়ে বলল, বেআদব কোথাকার। আমার কথার উপর কথা বলা! এক্ষুণি তোকে আমি গুলী করব।

সুধা ছুটে এসে বলল, তোমার কি হয়েছে বল দেখি ?

ঘনশ্যাম সুধাকে বলল, ওকে বল আমার কাছে ক্ষমা চাইতে, না হলে আমি তাকে এক্ষুণি গুলী করব।

বসন্ত উজির বলল, যেসব ছেলেমেয়ে মহারাজের নির্দেশ পালন করবে না তাদের গুলী করে হত্যা করা হবে।

সবার অনুরোধে অবশেষে সুখো ঘনশ্যামের কাছে ভুল স্বীকার করল।

কয়েকদিন পর ছেলেমেয়ে সবাই দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। একদলে রইল ঘনশ্যাম, বসন্ত ও রুস্তম অন্য দলে রইল বাকি সব ছেলেমেয়ে। ঘনশ্যাম সুধাকে অলঙ্কারের লোভ দেখালো এবং রাজকুমারীর পদ দিতে চাইল কিন্তু সে কিছুতেই এদের দলে ভিড়ল না। বরং ঘনশ্যামকে বলল, তোমাদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, চিকিৎসা করতে হবে। কিন্তু বললেই তো আর চিকিৎসা করা যায় না। চিকিৎসা করবে কে ? তাছাড়া ঘনশ্যামের কাছে গাদা বন্দুক, বসন্তের কাছে তলোয়ার, রুস্তমের কাছে কুঠার রয়েছে। এসব অস্ত্রের ভয়ে অন্যেরা এদের কাজ করে দেয়, কথা শোনে। সব ছেলেমেয়ের এদের কাছে চাকরের মতো অবস্থা দাঁড়িয়েছে। এরা বসে বসে আদেশ

দেয় আর ওরা পালন করে কারণ কথায় কথায় অস্ত্রের ভয়, শাস্তির হুমকি প্রদান করা হয়।

একদিন গোপাল দাঁতে দাঁত পিষে বলল, ঘনশ্যামের আদেশ পালন করা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়, আমি লড়াই করব।

কাসেম বলল, আমি তোমার সঙ্গে আছি, হতভাগা গতরাতে আমাকে দিয়ে পা টিপিয়েছে।

সুখো আশঙ্কা প্রকাশ করে বলল, সে যে গুলী করবে।

জামু সাহস করে বলল, গুলী করলে করুকগে। বদমাশকে প্রতিদিন আমাকে গোসল করাতে হয়। শুধু কি তাই? বসন্ত এবং রুস্তমকে তার আদেশে গোসল করাতে হয়। রুস্তমকে গোসল করানো তো একটা মহিষকে গোসল করানোর মত কষ্টকর।

মিস বাটিনিওয়ালা ওরফে কাজলা বলল, আমাকে মহারাজের মাথার উকুন বেছে বের করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। ইস্, এই ঘনশ্যামটা যে কী জঘন্য!

হোসনা দুঃখ করে বলল, গত রাতে খাবার দিতে একটু দেরী হওয়ায় রাজা কলার খোশা আমার মুখে ছুঁড়ে মেরেছে। কি আমার রাজারে! কতো কষ্ট করে আমরা খাবার তৈরি করি আর ওঁদের মেজাজ দেখে গা জ্বলে যায়।

সুখো বলল, কি বলেছিল?

হোসনা বলল, বলে কি খাবার বিস্বাদ, খেতে ভাল লাগে না।

কাসেম হাত মুষ্টিবদ্ধ করে বলল, নবাবপুত্তুরকে মজা দেখাব।

জামু জিজ্ঞেস করল, কিন্তু কিভাবে?

সুখো বলল, আমি একটা বুদ্ধি চিন্তা করেছি।

কাসেম বলল, বল।

সুখো বলল, কানে কানে বলব। কাসেম সুখোর কাছে আসার পর সুখো কাসেমের কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলল, কাসেম খিলখিল করে হেসে উঠল।

সেদিন সবাই রাজার মনস্তুষ্টির জন্য সচেষ্ট হল। সব আদেশ পালন করল। হেসে হেসে জ্বী জ্বী বলে কথা বলল। কলার পাতায় রকমারি খাবার সাজিয়ে রাজাকে পরিবেশন করল। রাজার খাবার গ্রহণের সময়ে পাতাভরা শাখা দিয়ে রাজার গায়ে বাতাস করল।

সেদিন গভীর রাতে রাজা, উজির ও তার সেনাপতির ঘুমানোর পর কাসেম, সুখো ও গোপাল ধীরে ধীরে বিছানা ত্যাগ করে রাজার বন্দুক, উজিরের তলোয়ার এবং সেনাপতির কুঠার তুলে নিয়ে সমুদ্রের পানিতে ফেলে দিয়ে আসল। সকালে রাজা তার বন্দুক পেলনা, উজির তার তলোয়ার পেল না, সেনাপতি তার কুঠার পেল না। এতে তারা ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু অস্ত্র হারিয়েও তারা ছেলে-মেয়েদের সেবাযত্ন পূর্বের মতো লাভ করল। এতে তারা বেশ নিশ্চিন্ত হল। দুপুরে সবাই খেতে বসল। রাজা, উজির এবং তার সেনাপতি আলাদা স্থানে গিয়ে বসল। তাদের সামনেও তাজা কলাপাতা বিছিয়ে দেয়া হল। কিন্তু ঘনশ্যাম দেখে বিস্মিত হল যে, তাদের খাদ্যদ্রব্যের স্থলে হীরা মোতি, সোনার মোহর সাজিয়ে দেয়া হয়েছে।

ঘনশ্যাম ক্ষেপে গেল, একি রসিকতা করা হচ্ছে ?

হোসনা বলল, এটা রসিকতা নয়, এইই তোমাদের খাবার।

আমরা এই পাথর খাব ? রুস্তম বিস্ময়ভরে জিজ্ঞেস করল।

সুধা মিষ্টি কণ্ঠে বলল, যে পাথরের জন্য তোমরা আমাদের থেকে পৃথক হয়ে গিয়ে হামবড়া ভাব দেখাচ্ছ সেই পাথরই তোমরা খাবে।

কি যা তা বকছ----ঘনশ্যাম বলল।

কাসেম বলল, মাননীয় রাজা সাহেব, বাজে কথা আমরা একটুও বলছি না। আপনাদের সম্পদ আপনারা খান। সোনার লাড্ডু, হীরের বরফি, সোনার মোহরের চকলেট।

ঘনশ্যাম চিৎকার ক'রে বলল, এসব কি কেউ কখনো খেতে পারে ?

গোপাল পরামর্শ দিল, দ্বীপ-ই-আজম চেষ্টা করে দেখুন।

ঘনশ্যাম ক্রোধভরে গোপালকে ঘুষি দিতে এল।

এ সময়ে কাসেম, জামু, গোপাল, সুখো সামনে এগিয়ে ঘুষি দেখিয়ে বলল, এক পা এগোলে ভাল হবে না বলছি ঘনশ্যাম।

ঘনশ্যাম, বসন্ত ও রুস্তম বিরুদ্ধ পক্ষের ছেলেদের একতাবদ্ধ রণমূর্তি দেখে সভয়ে পিছিয়ে গেল। ছেলেরা তাদের তিনজনকে টেনে ঘরের পাঠকক্ষে বন্দী করে রাখল এবং নিজেরা মজা করে খাবার খেল।

মোটা রুস্তম ক্ষুধায় অস্থির হয়ে উঠল। দেয়ালের ফাঁক দিয়ে সে সব খাদ্যগ্রহণকারী ছেলেমেয়েদের দিকে কাতর চোখে তাকাল। তার মুখ থেকে লালা পড়তে শুরু করল। সে জামুকে ইশারায় কাছে ডেকে এনে বলল, আমরা কি আসলেই খেতে পাব না?

জামু বলল, না।

কোন শর্তেই না? বসন্ত জিজ্ঞেস করল।

সুখো বলল, একটা শর্তে খেতে পার। যে কাজ করবে সে খেতে পারে, কাজ বন্ধ, খাবার বন্ধ।

বসন্ত বলল, আমি কাজ করতে রাজি আছি।

ঘনশ্যাম বসন্তকে ধমক দিয়ে বলল, সাবধান মন্ত্রী, আবার এরকম কথা বললে কিন্তু মন্ত্রিত্ব কেড়ে নেব।

রুস্তম ঘনশ্যামকে বুঝিয়ে বলল, মেনে নাও রাজা সাহেব, কাজ করলে আমরা সবাই খেতে পাব।

এ সময়ে খাওয়া শেষ করে অন্য ছেলেমেয়েরা এদের কাছে এল এবং এদের দেখিয়ে নেচে গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে লাগল। তারা গাইতে লাগল ঃ---

রাজা সাহেব পস্তাবেন কাঁদবেন এবং গাবেন
সোনা রূপা গিলবেন মোতি মুক্তা খাবেন।
রুটি কখনো পাবেন না
রুটি কখনো পাবেন না।
হায়, রুটি কখনো পাবেন না।

তারপর সব ছেলেমেয়ে ওদের তিনজনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, ঠিঙ্গা---ঠিঙ্গা---ঠিঙ্গা।

আবার সবাই কোরাস গাইতে লাগল ঃ

রাজা সাহেব পস্তাবেন কাজ থেকে দূরে যাবেন
শুকনো মাটি কুড়োবেন কংকর পাথর খাবেন।
রুটি কখনো পাবেন না।
রুটি কখনো পাবেন না।
হায়, রুটি কখনো পাবেন না
ঠিঙ্গা---ঠিঙ্গা---ঠিঙ্গা।
রাজা সাহেব পস্তাবেন প্রাসাদের বাইরে যাবেন
কানে ধরে নাচবেন নাকে ধরে গাবেন।

তখন তিনি রুটি পাবেন
তখন তিনি রুটি পাবেন
হায়. তখন তিনি রুটি পাবেন।
হো হো বিল্লে বিল্লে হো হো ধুম
ধুম ধুম ধড়াক্কা।

(গীতিকার সরদার জাফরী)

ছেলে-মেয়েদের নাচে-গানে লজ্জিত হয়ে রুস্তম গলায় মোতির মালা ছিঁড়ে ছেলেদের দিকে ছুঁড়ে দিল, বসন্ত তাঁর হীরের বাজুবন্দ ফেলে দিল। সবশেষে স্বঘোষিত রাজা ঘনশ্যাম লজ্জিত হয়ে হীরের মুকুট খুলে ফেলল। সবাই তখন কামরার দ্বার খুলে ফেলল, এতে ঘনশ্যাম, বসন্ত ও রুস্তম বাইরে বেরিয়ে এল এবং নাচে গানে চারদিক মাতিয়ে তুলল।

হঠাৎ আকাশে ঘড় ঘড় আওয়াজ শোনা গেল। সুখো আনন্দে চিৎকার করে বলল, উড়োজাহাজ। তারপর তার দেখাদেখি সবাই ঘর থেকে বেরিয়ে সমুদ্রের তীরে জড় হল। সবাই তখন হাত নেড়ে 'থামাও থামাও' শব্দ করল। কিন্তু তাদের চিৎকার চালকদের কানে পেঁাছাল না, একটা জাহাজও থামল না।

বসন্ত দুঃখিত স্বরে বলল, এতগুলো বিমান এলো অথচ আমাদের জন্য একটাও থামল না।

কাসেম তাকে বুঝিয়ে বলল, বিমান নয় উড়োজাহাজ।

বসন্ত তার জেদে অটল রইল। না উড়োজাহাজ নয় বিমান।

---বিমান নয় উড়ো জাহাজ।

---উড়োজাহাজ নয় বিমান।

রুস্তম মীমাংসামূলকভাবে বলল, আরে বাবা, ওসব না বলে সোজাসুজি বল যে, এরোপ্লেন।

ঘনশ্যাম বলল, উড়োজাহাজ, বিমান, এরোপ্লেন যা কিছুই বলো না কেন এতে ওদের কিছুই যায় আসে না।

হোসনা বলল, আমরা ওদের দেখতে পাই, কিন্তু পাইলটরা কি আমাদের দেখেনা ?

সুধা বলল, নিশ্চয়ই দেখে।

হোসনা উদাসভাবে বলল, তবে আমাদের সাহায্যের জন্য আসে না কেন ?

রুস্তম বলল, এই না আসার একটা কারণ হতে পারে আমাদের ঘর ।

সুধা জিজ্ঞেস করল, আমাদের ঘর ? এর সাথে আমাদের ঘরের কি সম্পর্ক ?

রুস্তম বলল, এত উঁচুতে থেকে উড়ো জাহাজের পাইলট আমাদের কণ্ঠস্বর শুনতে পায় না কিন্তু দেখতে পারে। কি দেখতে পারে জান ?

কাসেম বলল, দেখতে পারে আমাদের কুঁড়েঘর আর তার উপর ওড়ানো বাতাসে দোল খাওয়া পতাকা ।

রুস্তম বলল, ঠিক বলেছ, ওরা এ বিরান দ্বীপে একটা ঘর দেখে মনে করতে পারে যে, আরো ঘর রয়েছে ।

বসন্ত বলল, কিন্তু কেন ওরা বুঝতে পারে না ? ওরা কি জানে না যে আমরা হারানো সন্তান ?

রুস্তম বলল, না পারে না । ওরা মনে করে যে, ছেলেরা আমাদের হাত নেড়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে । যাদের এতো সুন্দর ঘর আছে ওরা হারিয়ে যাওয়া হয় কি করে ?

ঘনশ্যাম বলল, এর অর্থ হল আমাদের ঘর আমাদের দুশমন । আমি বলছি এ দ্বীপ থেকে যদি জীবিতাবস্থায় উদ্ধার পেতে চাও তবে এ ঘর ভেঙে ফেল । বল কে যাবে আমার সঙ্গে ?

সুখো ঘর রক্ষা করার চেষ্টা করল । ঘনশ্যাম ও কিছুসংখ্যক বিক্ষুব্ধ ছেলেমেয়ে বলল সুখো সরে যাও ।

সুখো ঘনশ্যামকে বুঝিয়ে বলল, আমি সরে যাব না ঘনশ্যাম, তোমরা কি পাগল হয়েছ ? এটা আমাদের ঘর, আমরা সবাই মিলে এটি তৈরি করেছি, আমি তোমাদের এ ঘর ভাঙতে দেব না ।

ঘনশ্যাম সুখোকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল । সব ছেলেমেয়ে ইট পাথর লাঠি নিয়ে ঘর ভাঙতে এগিয়ে গেল, এমন সময় সমুদ্রের দিক থেকে আবার উড়োজাহাজের শব্দ শোনা গেল ।

সবাই তাকিয়ে দেখল একটা হেলিকপ্টার খুব নীচু দিয়ে উড়ে আসছে ।

জামু চিৎকার করে বলল, উড়োজাহাজ ।

বসন্ত বলল, এরোপ্লেন ।

ঘনশ্যাম বলল, এরোপ্লেন নয় হেলিকপ্টার।

হেলিকপ্টার গাছের উপর দিয়ে উড়ে চলে গেল। সবাই হৈ চৈ করে উঠল। ঘনশ্যাম হতাশভাবে বলল, এটাও আমাদের ছেড়ে চলে গেছে।

তারপর সবাই হতাশ হয়ে বেদনা-ভারাক্রান্ত মনে সমুদ্রতটে বালুকায় বসে পড়ল। তাদের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল, কেউ আবার হাউ মাউ করে কেঁদে উঠল। ততক্ষণে হেলিকপ্টার আরো নীচু দিয়ে উড়ে ফিরে এসেছে। ওরা দেখল হেলিকপ্টারে চালকের সাথে তাদের স্কুলের প্রধান শিক্ষক, যিনি পিকনিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন---রয়েছেন। ওরা আনন্দে চিৎকার করে বলল, স্যার, স্যার, স্যার।

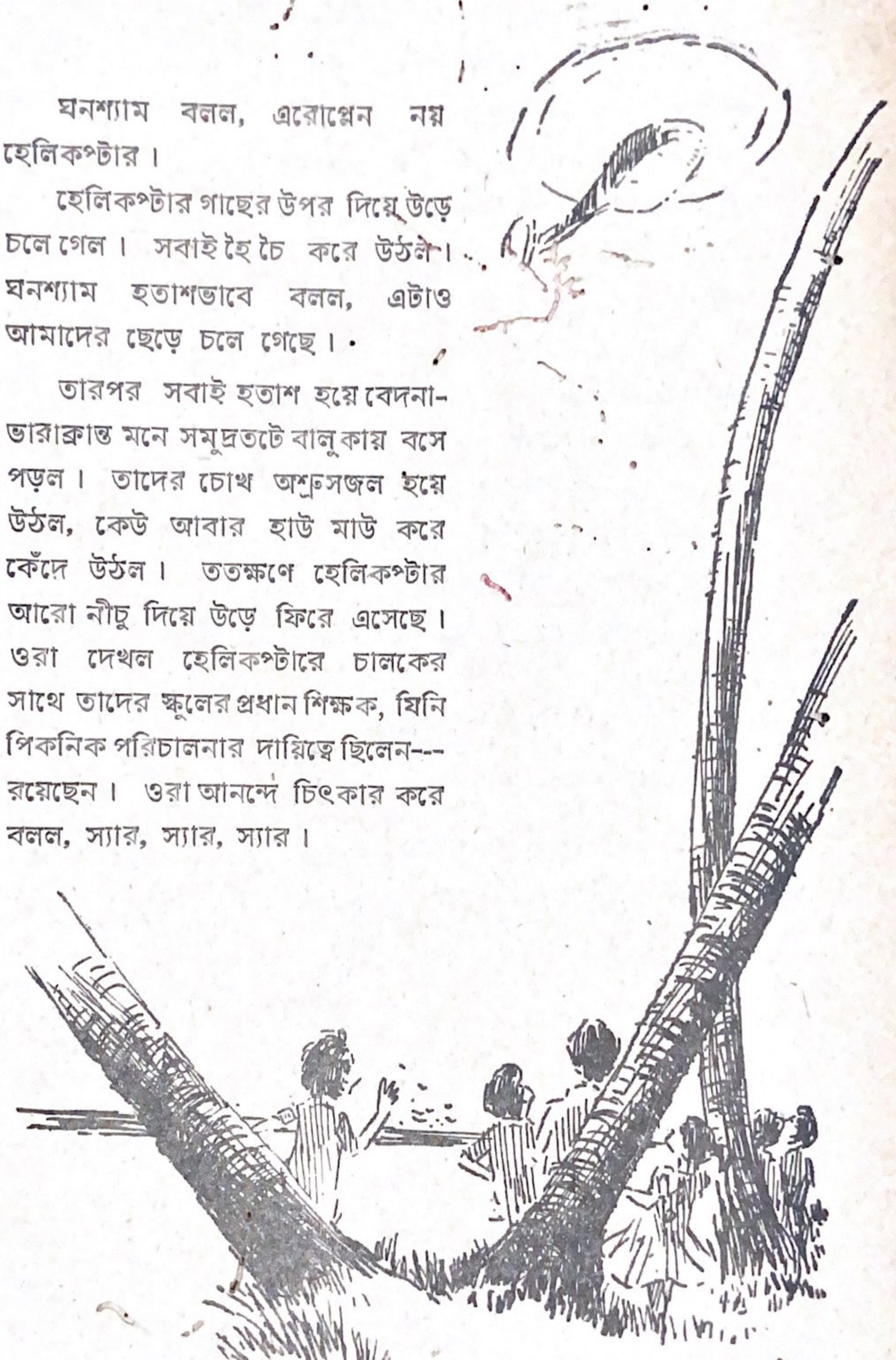

নীচু দিয়ে উড়ে উড়ে এক সময়ে হেলিকপ্টার সমুদ্রতটে এসে অবতরণ করল। চালক ও প্রধান শিক্ষক নীচে নেমে এলেন। ছেলেরা তাদের ঘিরে ধরল, মেয়েরা খুশীতে কেঁদে ফেলল।

শিক্ষক বললেন, তোমাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের কয়েকবার আসতে হবে। এ হেলিকপ্টারে সবাই একত্রে যেতে পারবে না। প্রথমে মেয়েদের নেয়া হবে। মেয়েরা তোমরা প্রস্তুত হও।

সুধা বলল, এক মিনিট স্যার, যাওয়ার আগে আমাদের ঘরকে প্রণাম জানিয়ে আসি। আপনি এবং চালক সাহেবও আসুন, আমাদের ঘর একবার দেখে যান।

ঘর দেখাতে গিয়ে সুধা বলল, স্যার কেমন লাগছে আমাদের ঘর?

শিক্ষক বললেন, খুব ভাল, খুব সুন্দর।

সুধা বলল, আমরা সবাই মিলে এ ঘর তৈরি করেছি।

তারপর সবাই একত্রে চিৎকার করে বলল, 'আমাদের ঘর' —জিন্দাবাদ।